

রঘুবংশের গল্প



রঘুবংশের গল্প

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : দীপান্বিতা, ১৩৭১
দাম : ২'৭৫

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় রায় কর্তৃক মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

উপহার



ভূমিকা

মহাকবি কালিদাস তাঁর নাটক ও কাব্যের মধ্যে কোথাও তাঁর স্বপরিচয় দেন নি। কোন্ দেশে তাঁর গৃহ, তাঁর শিক্ষাদীক্ষাবংশসম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যই বা কি, কোন্ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম বা মৃত্যু এ সব জানবার কোন উপায়ই নেই। নিজেকে এমনভাবে প্রচ্ছন্ন রেখে লোকোত্তর কাব্যসৃষ্টি হয়ত ভারতবর্ষের কবিদের পক্ষেই সম্ভব।

কালিদাসসম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী বহুদিন থেকে লোকের মুখে-মুখে চলে আসছে। কোন্ বিক্রমাদিত্য-রাজার রাজসভা তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন, সে বিষয়ে তর্কসঙ্কুল গবেষণার অন্ত নেই। বিক্রমাদিত্য কোন বড় রাজার উপাধি মাত্র, নাম নয়। অন্তর্প্রমাণ ও বহির্প্রমাণের দ্বারা অনেকক্ষেত্রে কবিসম্বন্ধে কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কালিদাসের কাব্যে সেগুলি এতই অস্পষ্ট যে, নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না। ভৌগোলিক তথ্য, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, আচার-ব্যবহার, কুলপ্রথা, বিবাহপদ্ধতি প্রভৃতি কালিদাসের কাব্যে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সভ্যতার কিছু অংশ আমরা জানতে পারি, কিন্তু তাহাদ্বারা কালিদাসের সঠিক কালনির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। কালিদাসের যুগকে চেষ্টা করে হয়ত আমরা অনুমান করে নিতে পারি, কিন্তু কালিদাসের স্বল্পপরিসর জীবনবৃত্তে যে তমসা ঘনিয়ে আছে, তার উপর আলোকপাত করে তাকে অপসরণ করা একপ্রকার অসাধ্য বললেই চলে।

সব চেয়ে বড় আশ্চর্যের কথা, কালিদাসের সমসাময়িক কোন লেখকই কালিদাসসম্বন্ধে কিছু লিখে যান নি। তাঁর কাব্য-টীকাকার

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথও কোন আলোকপাত করতে সমর্থ হন নি। কিন্তু কেন যে এটা ঘট্‌ল, সে বিষয়ে যুক্তিযুক্ত অভিমত কেউ দিতে পারেন নি। কালিদাস চিরদিন অন্ধকারেই রয়ে গেলেন।

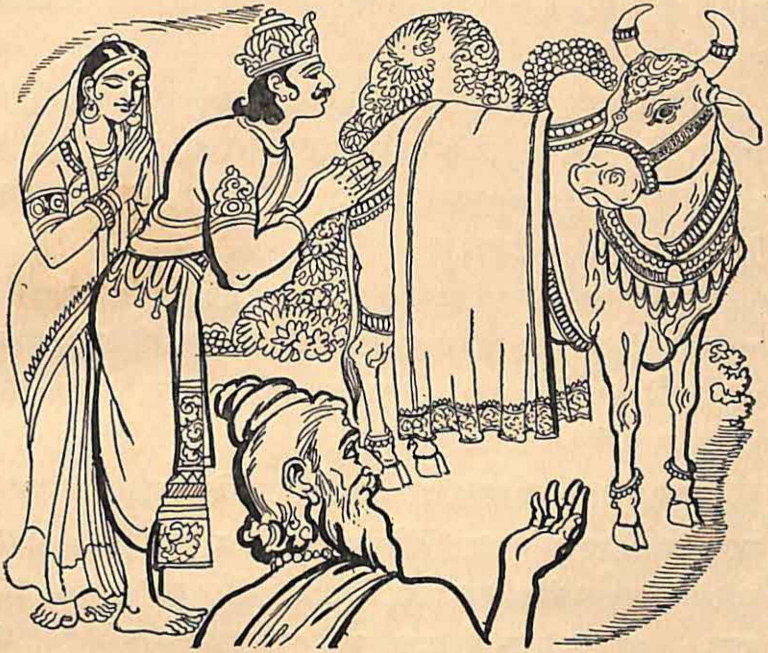
কালিদাসের যুগ যে ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগ, কোন কোন গবেষণাকারী এটা সহজেই প্রমাণ করতে পেরেছেন। সে যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক চূড়ান্ত নিদর্শন আমরা কালিদাসের কাব্যে দেখতে পাই। রঘুবংশম্ কালিদাসের কবিপ্রতিভার এক উন্নত নিদর্শন। রামায়ণ-বর্ণিত চরিত্রগুলি তাঁর লেখনীস্পর্শে অধিকতর সজীব হয়ে উঠেছে। তিনি মূলতঃ রামায়ণকে অবলম্বন করলেও তাঁর শিল্পসৃষ্টির গুণে আখ্যানভাগের বহু অংশ হয়েছে মধুর ও রূপোজ্জ্বল। রামায়ণে কথিত দৃশ্যগুলির অনেক অপরিস্ফুট ইঙ্গিত তিনি তাঁর কাব্যে সুচারুভাবে পরিস্ফুট করেছেন, আবার অনেক বিষয় সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। অনেকস্থলে হুবহু রামায়ণকে অনুসরণ না করলেও রামায়ণের বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যের সর্বত্র বর্তমান, আখ্যানাংশ কোথাও শিথিলতা পায় নি। 'রঘুবংশের গল্পে' আমি যতদূর সম্ভব কালিদাসের কাব্যসৌন্দর্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, তবে আমার গ্রন্থের অল্পপরিসর আয়তনের কথা ভেবে অনেকস্থলে আমাকে সংযত হতে হয়েছে।

এই গ্রন্থ-রচনায় আমি যাঁদের কাছে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কথা চিরদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ করব।

৫।১এ, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো
কলিকাতা ৯

শ্রীকৃষ্ণধন দে

সূচীপত্র



রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণা

সে অনেকদিন আগেকার কথা, মহারাজ দিলীপ তখন অযোধ্যার রাজা।

যেমন সুন্দর তাঁর চেহারা, স্বভাবও তেমনি মধুর। আর হবে না-ই বা কেন? বৈবস্বত মনুর বংশে জন্ম ত!

পরের দুঃখ দেখলে তাঁর হৃদয় উঠত কেঁদে। প্রজাদের কাছ থেকে তিনি যে কর আদায় করতেন নিজের সুখের জন্যে তা' খরচ না করে ফিরিয়ে দিতেন প্রজাদেরই কাছে দেশের মঙ্গলজনক কাজে। সূর্য যেমন পৃথিবী থেকে জল শুষে নিয়ে মেঘের সৃষ্টি করে, আবার

সেই মেঘ থেকে জলবর্ষণ করে পৃথিবীর বুকে, রাজা দিলীপও প্রজাদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ রাজভাণ্ডারে জমা করে না রেখে প্রজাদেরই কাজে তা' খরচ করতেন।

বাপ মা যেমন সন্তানদের পালন করেন, লেখাপড়া শেখান, ভাল ব্যবহার, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ যাতে তারা পায় তার জন্যে চেষ্টা করেন, রাজা দিলীপও তেমনি প্রজাদের পালক হয়ে তাদের সব দিক দিয়ে উন্নতিবিধান করতেন।

তাঁর সুশাসন দেখে স্বর্গের দেবতারাও খুব সন্তুষ্ট। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী কাকে বলে সে দেশের কেউ তা' জানত না। চুরি-ডাকাতির কথা লোকে শুধু বইয়ে পড়ত, ঘটতে কেউ কখনো দেখে নি।

এমন সুশাসক যে রাজা, তারও মনে সুখ ছিল না। বংশরক্ষার জন্যে একটি ছেলের অভাব তিনি সর্বদাই বোধ করতেন। রাজার মনে এই দুঃখ যে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বংশ লোপ পেয়ে যাবে। এমন যে মহান সূর্যবংশ, তার পূর্বপুরুষদের কেউ যদি এক গণ্ডুষ জল দেবার না থাকে তাহলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? রাজ-অন্তঃপুরে মহিষীর সংখ্যা কম নয়, কিন্তু কেউই পুত্রবতী হয় নি। মহিষীদের মধ্যে সুদক্ষিণাই ছিলেন পাটরাণী। রাজা সবচেয়ে তাঁকেই বেশী ভালবাসতেন। মহারাজ দিলীপের মনঃকষ্টের কারণ বুঝতে পেরে রাণী সুদক্ষিণা রাজাকে বললেন, "মহারাজ, যাগযজ্ঞ করে, দেবতাদের সন্তুষ্ট করে অনেকেরই তো সন্তানলাভ হয়েছে একথা শুনেছি। এখন যদি আপনি আমাদের কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশ নিয়ে যাগযজ্ঞ করেন, তাহলে আমার মনে হয় হয়তো আমাদের বাসনা পূর্ণ হতে পারে।"

রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণা

রাজা দিলীপ প্রিয়মহিষী সুদক্ষিণার কথা শুনে ভাবলেন—রাণী ঠিক কথাই বলেছেন। তখন একদিন ভাল দিন দেখে তিনি সুদক্ষিণাকে সঙ্গে নিয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন। পথে নানা দৃশ্য দেখে রাণী অত্যন্ত আনন্দিত। পথের মধ্যে অনেক শুভলক্ষণও তাঁদের চোখে পড়ল। বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় রাজা ও রাণী দেখতে পেলেন,—ময়ূর-ময়ূরীরা আনন্দে নাচছে, হরিণ-হরিণীরা সরল চোখে তাঁদের রথের দিকে চেয়ে আছে, সারস-সারসীরা মধুর ধ্বনি তুলে বড়-বড় পুকুরে সাঁতার কাটছে। বনে যে-সব ফুল ফুটেছে তাদের গন্ধ কি মনোরম! বনের তরুলতা কাঁপিয়ে যে বাতাস বইছে—সে বাতাস কত স্নিগ্ধ, কত মধুর! তাঁদের মনে হল বনদেবী যেন তাঁদের জন্য সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে বনপথে দাঁড়িয়ে আছেন। বনের আশেপাশে যে-সব গ্রাম, তাদের অধিবাসীরা খবর পেয়ে ছুটে এসেছে রাজা ও রাণীকে দেখতে। গ্রামের বৃদ্ধ গয়লারা সকলে ভাঁড়ে করে খাঁটি ঘৃত নিয়ে এল রাজাকে উপহার দেবার জন্যে। রাজার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হয়ে তারা সকলেই রাজার জয়গান করতে লাগল। এইভাবে বনপথ অতিক্রম করে তাঁদের রথ যখন বশিষ্ঠের আশ্রমে পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যা। মুনিঋষিরা বন থেকে সমিধ, কুশ ও ফল সংগ্রহ করে তখন আশ্রমে ফিরছিলেন। তাঁদের শরীর কি সুন্দর! যেন একটা অপূর্ব তেজ বার হচ্ছে সেই শরীর থেকে। আশ্রমে যে-সব পালিত হরিণ-হরিণী থাকে তাদের শাবকেরা সারাদিন বনের মধ্যে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখন সন্ধ্যা হয়েছে জানতে পেরে আশ্রমে তাদের মায়ের কাছে আসবার সময় রাজার রথ দেখে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল। মুনিকন্যারা সারাদিনের পর আশ্রমের ছোট-ছোট গাছে জলসেচন করছিল। তাদের সেই সুন্দর দেহ আর সরল চাহনি দেখে

রাজা ও রাণী মুগ্ধ হলেন। যে-যে গাছের তলায় জল দেওয়া হচ্ছিল, পাখীরা উড়ে এসে তখুনি সেই জল পান করে সারাদিনের তৃষ্ণা নিবারণ করছিল।

রথ ক্রমে ক্রমে আশ্রমের কাছে এসে উপস্থিত হল। রাজা-রাণীকে রথের উপর দেখে আশ্রমবাসী মুনিঋষিরা ছুটে এসে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করে আশীর্বাদ জানালেন। রাজা রথ থেকে আগে নামলেন, তারপর রাণীকে হাত ধরে নামালেন। মুনিঋষিরা তখন রাজা ও রাণীকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে উপস্থিত হলেন।

গোধূলির সময় সান্ধ্যাহ্নিক সেরে বশিষ্ঠ তখন তাঁর পত্নী অরুন্ধতীর সঙ্গে ধর্মালোচনা করছিলেন। রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণাকে দেখে বশিষ্ঠদেব প্রথমে একটু আশ্চর্য হলেন। কিন্তু যোগবলে তাঁদের অভিপ্রায় জেনে খুবই আনন্দিত হলেন। রাজা ও রাণী কুলগুরু বশিষ্ঠের ও গুরুপত্নী অরুন্ধতীর চরণ বন্দনা করে হাতজোড় করে বললেন, "আপনি সর্বজ্ঞ। আমরা কেন আপনার আশ্রমে এসেছি আপনি তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।" বশিষ্ঠদেব তাঁদের আশীর্বাদ করে কাছে বসিয়ে রাজ্যের ও প্রজাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বললেন, "গুরুদেব, আপনার আশীর্বাদে রাজ্যে সব কুশল। আপনার মত হিতৈষী যোগীশ্রেষ্ঠ যে রাজ্যের সর্বদা মঙ্গল কামনা করেন তার উন্নতি না হয়ে কি পারে! প্রজাদের ঘরে অভাব নেই, রাজ্যে চোর-ডাকাতের ভয় নেই। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি কোনদিন এ রাজ্যে দেখা যায় নি। কিন্তু আপনি তো সবই বোঝেন, এত সুখেও আমার অন্তরে শান্তি নাই। আমার মহিষীদের মধ্যে কেউ পুত্রবতী হয় নি। এমন যে সূর্যবংশ তার যদি লোপ হয় তাহলে তার চেয়ে

দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে। আপনি জানেন, আমি যখন আমার পূর্বপুরুষদের তর্পণ ও পিণ্ডদান করি তখনই আমার মনে হয় তাঁরা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেই পিণ্ডই শেষ পিণ্ড ভেবে কাতরভাবে আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন। সে দীর্ঘনিঃশ্বাসের স্পর্শ আমি যেন আমার সর্বদেহে অনুভব করে থাকি। আমার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের এ গভীর মর্মবেদনা আমাকে সব সময় অস্থির করে তোলে। অথচ, আমার নিজের এ বিষয়ে কি-বা করার আছে। ইক্ষ্বাকু বংশের আপনি কুলপুরোহিত। এই বংশ রক্ষা করা একমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব। এ বংশের ইষ্টানিষ্ট আপনি যতটা দেখবেন ততটা কেউ দেখবে না। এখন আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি। যাতে আমাদের পুত্রলাভ হয়, বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে আপনি ছাড়া কে আর আমাদের সাহায্য করবে!"

বশিষ্ঠদেব রাজার সব কথা শুনে ভাবলেন, এমন তো হবার নয়। তবে কেন সূর্যবংশ চিরদিনের জন্য লোপ পাবে। তিনি তখনই ধ্যানস্থ হয়ে যোগবলে এর কারণ জানতে পারলেন। তারপর ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি রাজাকে বললেন, "মহারাজ, কি কারণে আপনি এখন অপুত্রক সে ঘটনা আপনাকে বলছি, আপনি শুনুন। আপনার বোধহয় মনে আছে, আপনি একবার দেবরাজ ইন্দ্রের নিমন্ত্রণে স্বর্গে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রণ সেরে আপনি যখন মর্তে আসছিলেন তখন স্বর্গের কামধেনু সুরভি পথে দাঁড়িয়েছিলেন। আপনি তাঁকে সামান্য গাভী মনে করে তাঁকে দেখেও দেখেন নি। গোমাতা সুরভি তখন আপনার এই উপেক্ষায় নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে আপনাকে অভিশাপ দেন, 'তুমি অপুত্রক হও।' সেই অভিশাপে আপনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত। এর একমাত্র উপায়—আপনি

বিধিমত কামধেনু সুরভিকে পূজার্চনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করুন। কিন্তু এখন এক বিভ্রাট উপস্থিত। সুরভি গেছেন পাতালে বরুণরাজের যজ্ঞে দুধ জোগাতে। এখন তো তাঁকে পাওয়া যাবে না। আপনি যখন আশ্রমে এসেছেন তখন সুরভিকন্যা নন্দিনীকে সেবা ও অর্চনা করুন। সুরভি যেমন কামধেনু, নন্দিনীও তাই। সুতরাং কামধেনু নন্দিনীর সেবা করলেও নিশ্চয়ই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আপনি সুরভির অভিশাপ থেকে মুক্ত হবেন।"

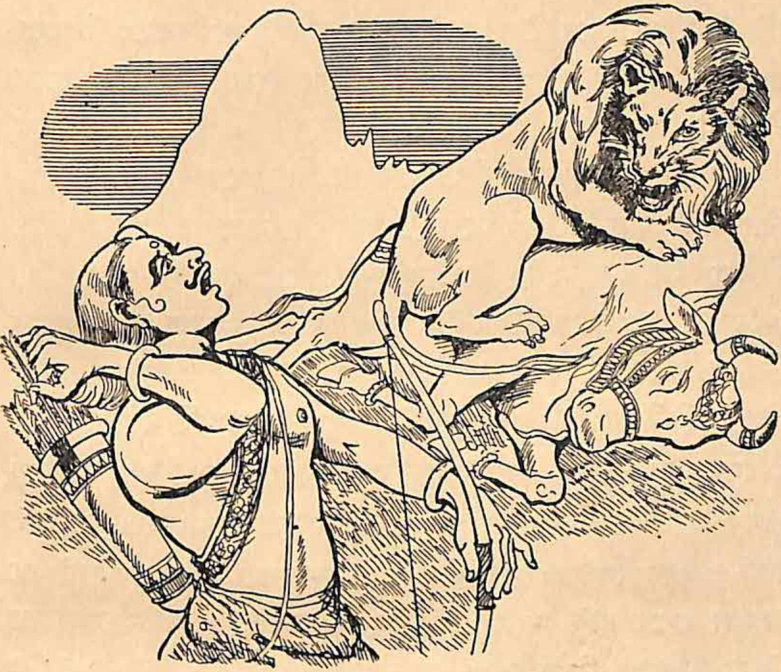
মহর্ষি বশিষ্ঠের সকল কথা শুনে রাজা ও রাণী যেন অকূলে কূল পেলেন। যেই মাত্র বশিষ্ঠদেবের কথা শেষ হয়েছে অমনই নন্দিনী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজার মনে হল, এমন অঘটন তো বড় একটা ঘটে না। নিশ্চয় এ অতি শুভ লক্ষণ। নন্দিনীরূপ ধরে সিদ্ধি যেন রাজাকে আশীর্বাদ করতে এলেন। বশিষ্ঠদেব মৃদু হেসে বললেন, "মহারাজ, আপনার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ হবে। দেখুন না কেন, নন্দিনীর নাম করতে না করতেই সে আপনার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

রাজা দিলীপ তখন মনে মনে খুব আশ্বস্ত হয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। বশিষ্ঠদেবও রাজাকে 'তুমি পুত্রবান হও' এই আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু নন্দিনীর সেবা করতে গেলে আশ্রমেই থাকতে হয় রাজা-রাণীকে। বশিষ্ঠদেবও সেই ব্যবস্থা করলেন। সে আশ্রমে রাজভোগ আসবে কোথা থেকে! তাই মুনিঋষিরা যেমন ফলমূল খেয়েই দিন কাটান সেইরকম রাজা ও রাণীকে বনের ফলমূল খেয়েই আশ্রমে থাকতে হল। সোনার পালঙ্কে কোমল-সজ্জায় রাজা ও রাণীর রাত্রিতে ঘুমোবার অভ্যাস ছিল। এখন মাটির উপর পাতার শয্যায় তাঁদের নিদ্রা যেতে হল। রাজপ্রাসাদে সকলপ্রকার

সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা মুনিঋষিদের মতই সামান্যভাবে দিন কাটাতে লাগলেন। রাজার মনে তখন পুত্রমুখ দেখবার আশাই প্রবল। সকল রকম কষ্ট অগ্রাহ্য করে তিনি শুধু পুত্রলাভের আশায় উৎফুল্ল হয়ে রইলেন।

গুরু বশিষ্ঠের নির্দেশে একমাত্র গো-সেবা ছাড়া রাজার আর কোন কাজ ছিল না। প্রাসাদে যেমন গায়কেরা গীতবাদ্য দ্বারা তাঁর ঘুম ভাঙাত আশ্রমেও ভোরবেলায় মুনিঋষিরা সুর করে বেদমন্ত্র পাঠ করতেন। আর সেই সুরে রাজার ঘুম ভাঙত। শয্যা থেকে উঠে রাজা ও রাণী যেতেন গোশালায় যেখানে থাকতেন নন্দিনী। সেখানে গিয়ে ভক্তিভরে ফুল ও চন্দন দিয়ে করতেন নন্দিনীকে বন্দনা। তারপর তাঁর সেবাযত্ন ও পূজার্চনা করে তাঁকে করতেন সন্তুষ্ট। তারপর নন্দিনী যখন গোশালা থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে আপন ইচ্ছায় বিচরণ করতে যেতেন রাজা দিলীপও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। যেখানে কচি পাতা ও নধর-কোমল ঘাস দেখতেন তখনই সেই ঘাস ও পাতা নিয়ে পরম যত্নে নন্দিনীকে খাওয়াতেন। নন্দিনীর সেবায় রাজার কোন ক্লান্তি ছিল না। নন্দিনীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চলতেন, নন্দিনী দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন, নন্দিনী বসলে তিনিও বসতেন। নন্দিনীর গায়ে যদি মশা কি মাছি এসে বসত রাজা তখনই মশামাছি তাড়িয়ে সযত্নে নন্দিনীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। এইভাবে সারাটা দিন নন্দিনীর রাখালি করেও রাজার আশা যেন মিটত না। যতটা পারেন নন্দিনীকে চোখে চোখে রাখতেন। রাজার রাজবেশ নেই, রাজমুকুট নেই, রাজ-অলংকার নেই, তবুও মনে হত ইনি রাজা ছাড়া আর কেউ নন। সমস্ত দেহ থেকে যেন রাজকীয় তেজ বার হত তাঁর! সমস্ত বনভূমি তখন রাজার কাছে

রাজপ্রাসাদেরই মত। গাছের উপর পাখীরা মধুর কণ্ঠে গান গাচ্ছে। রাজার মনে হত, যেন তিনি রাজসভায় বন্দনাকারীদেরই গান শুনছেন। বনের চঞ্চল বাতাসে কত ফুল উড়ে এসে রাজার গায়ে পড়ছে, রাজার মনে হত যেন তিনি তাঁর রাজ্যে পথে বেরোবার সময় পুত্রকন্যাদের হাতের খই-এর স্পর্শ অনুভব করছেন। রাজার এমনি মহিমা ছিল যে তাঁর শান্ত ও সৌম্য চেহারা দেখে বনের পশুরাও হিংসা-দ্বেষ ভুলে সকলে মিলে একসঙ্গে বনে বিচরণ করতে লাগলেন। সারাদিন বনে বনে, মাঠে মাঠে গোচারণ শেষ করে রাজা ফিরে আসতেন সন্ধ্যায়। দূর থেকে দেখতে পেতেন রাণী সুদক্ষিণা তাঁরই ফেরবার আশায় আশ্রমের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বনের দিকে চেয়ে আছেন। ধীরে ধীরে রাজা যখন নন্দিনীকে নিয়ে সুদক্ষিণার কাছে আসতেন তখন সুদক্ষিণাও নন্দিনীকে স্বাগত অর্চনা করে হাসিমুখে আশ্রমে নিয়ে যেতেন।



গাভী পড়ল সিংহের কবলে

রোজই এমনি হত। রাজার সেবার ত্রুটি নেই, ক্লান্তিও নেই। একদিন নন্দিনীকে নিয়ে একটু দূরে হিমালয়ের উপত্যকায় গেছেন। সেখানে কী অপরূপ সৌন্দর্য তাঁর চোখে পড়ল। প্রকৃতি যেন নিজের হাতে অতি অপরূপভাবে সেখানে তার খেলাঘর সাজিয়ে রেখেছে! কত গাছ, কত ফুল, কত ফল রাজার চোখে আনল নূতন বিস্ময়, নূতন মাধুর্য। রাজা যেন মুহূর্তের জন্যে নন্দিনীর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেলেন প্রকৃতির এই মনোহর

শোভার মাঝখানে। হঠাৎ এক ভীষণ হুঙ্কার ধ্বনি শুনে তিনি পিছন ফিরে চেয়ে দেখেন একটা প্রকাণ্ড সিংহ নন্দিনীর পিঠের উপর বসে নন্দিনীকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে আর নন্দিনী কাতরভাবে চিৎকার করছেন। নন্দিনীর চোখে মৃত্যুর কালো ছায়া। সিংহের চোখে জিঘাংসার আগুন। রাজা দেখলেন সর্বনাশ! এখনি তো নন্দিনীর প্রাণ যাবে। তিনি তখনই সিংহকে বধ করবার জন্যে বাম হাতে ধনুক নিয়ে দক্ষিণ হাত পিঠের তূণীরে দিয়ে শর বার করতে গেলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! এ কী হল! হাত আর তূণীর থেকে বাইরে আসে না। তূণীরেই যেন আটকে রইল। রাজা মনে মনে খুবই ভয় পেলেন আর নিরুপায়ভাবে নন্দিনীর করুণ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এমন বিপদে তিনি কোন দিন পড়েন নি। দুঃখে ক্রোধে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর সারা শরীর যেন আগুনে জ্বলতে লাগল। সাপুড়ে যেমন মন্ত্র দিয়ে ক্রুদ্ধ সাপকে শক্তিহীন করে দেয় রাজার মনে হল তিনিও যেন সেইরূপ শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। রাজার এই নিশ্চল অবস্থা দেখে নন্দিনীর পিঠের সিংহ মানুষের ভাষায় হঠাৎ কথা বলে উঠল, "দেখছেন কি মহারাজ, যেমন আছেন তেমনি থাকুন। একটুও নড়বার শক্তি আপনার নেই। যতই চেষ্টা করুন আপনার ও হাত আর খুলবে না, তূণীরেই আটকে থাকবে। আর আমাকে আপনি সামান্য সিংহ ভাবছেন। এই তো? আমি তা নই। এ স্থান দেবভূমি। আমি দেবাদিদেব মহাদেবের অনুচর সিংহ, কুম্ভোদর আমার নাম। আপনার সামনে যে দেবদারু বৃক্ষ শ্যামল পত্রে শোভা পাচ্ছে ওটি কি জানেন? ওটি হল স্বয়ং পার্বতীর অত্যন্ত স্নেহের ধন, তিনি খুবই ভালবাসেন এই গাছটাকে। তার নিজের ছেলে কার্তিককে যেমন তিনি কোলে করে স্তন্যদুগ্ধ পান করান এটিকেও তিনি নিজের হাতে জলসেচন

করে বাঁচিয়ে রাখেন। এই দেবদারু বৃক্ষটি বনের মধ্যে নানা শোভায় শাখাপ্রশাখায় বেড়ে উঠছে। কিন্তু একবার কোথা থেকে একটা বুনো হাতী এসে এই গাছটার অনেক ক্ষতি করে। তখন থেকেই পার্বতী আমাকে এটির রক্ষক হিসাবে থাকবার আদেশ দিয়েছেন, আমিও এর রক্ষক হিসাবেই থাকি। আজ দেখি এই সামান্য গাভীটার এতদূর স্পর্ধা যে এটা দেবদারু গাছের কচি পাতা দেখে এগিয়ে এসেছে কি-না এরই কাছে! মহাদেবের অনুগ্রহে এই গাছের কাছেই আমার আহারের জন্যে রোজই একটি করে বন্য পশু আসে। আমিও তাকে খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করি। আজ এই গাভীটির মত হৃষ্টপুষ্ট জন্তু যখন আমার কাছে এসেছে তখন তাকে আমি ছাড়ি কি করে? আর তা-ছাড়া আমার ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। গাভীটিও দেখছি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। এমন না হলে আর ভোজ! একে তো আমি ছেড়ে দিতেই পারি না। যদি নিজের মঙ্গল চান তাহলে এই গাভীকে ছেড়ে আপনি আশ্রমে ফিরে যান। দেখলেন তো আমাকে মারবার শক্তি পর্যন্ত আপনার নেই। এখন এ গাভী আমার ভক্ষ্য, আমি একে খাবই।”

রাজা দিলীপ স্তম্ভিত হয়ে ম্লান চোখে চেয়ে রইলেন সিংহের দিকে। শক্তিহারা তিনি, কি আর করতে পারেন মহাদেবের সিংহের বিরুদ্ধে। যে প্রভাবে তিনি এখন নিশ্চল সে প্রভাব থেকে কেউ তাঁকে মুক্ত করতে পারবে না। কোনক্রমে আত্মসংবরণ করে তিনি বললেন, “হে দেবাদিদেব মহাদেবের সিংহ, হে অমিতবলশালী পশুরাজ, গাভী এখন আপনারই অধীন। আপনি ইচ্ছা করলে ওকে বধ করতে পারেন, ছেড়েও দিতে পারেন। আমি এখন শক্তিহীন নিশ্চল। ঐ গাভীকে উদ্ধার করা আমার ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু আপনি যে-সে পশু নন। একে সিংহ তার উপর মহাদেবের আশ্রিত। একটি

অনুরোধ আপনি আমার রাখুন। ব্রাহ্মণের গাভীটিকে ছেড়ে দিয়ে আপনার ক্ষুধা দূর করবার জন্যে আমাকে ভক্ষণ করুন। এতে আপনার ক্ষুধাও নিবারিত হবে আর ব্রাহ্মণের গাভীও পরিত্রাণ পাবে।"

রাজার কথা শুনে সিংহ হো হো করে খানিকটা হেসে নিলে, তারপর বললে, "আপনি দেখছি হাসালেন মহারাজ! একজন একচ্ছত্র সম্রাট আপনি। জগতের প্রভুত্ব আপনার, বয়সে আপনি নবীন, শরীরও কান্তিময়, রূপও অতুলনীয়। সামান্য একটা জিনিসের জন্যে আপনার এতগুলো জিনিস হারাতে চান আপনি? এতে মনে হচ্ছে আপনার বিচারবুদ্ধি বড়ই কম। আপনার দুশ্চিন্তা এইজন্যে যে এটি আপনার পুরোহিতের গরু। কিন্তু আপনি রাজা। একটি গরুর বদলে আপনি তো কোটি-কোটি গরু আপনার পুরোহিতকে দিতে পারেন।"

রাজা সিংহের এ কথা শুনে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। সে কাজ আমার অসাধ্য নয়। কিন্তু আমি রাজা হলেও ক্ষত্রিয়। বিপন্নকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আমার কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের ঐ গাভীটিকে রক্ষা না করলে আমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব। আমি বনে মৃগয়ায় গিয়ে শত শত সিংহকে বধ করেছি। আজ যদি একটি মাত্র সিংহের হাত থেকে আমার কুলগুরু বশিষ্ঠের গাভীটিকে রক্ষা করতে না পারি তাহলে আমি চিরদিন লোকসমাজে নিন্দনীয় হয়ে থাকব। সকলেই আমাকে ভীরু ও দয়াহীন বলে মনে করবে। আপনি নিজে এই দেবদারু গাছটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যদি কেউ এই গাছটির ক্ষতি করে আর আপনি যদি তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা না করে আপনার প্রভুর সামনে গিয়ে দাঁড়ান তার চেয়ে মৃত্যুই

কি ভাল নয় ? আমিও এই গাভীটির রক্ষক। আমি যদি একে রক্ষা করতে না পারি তাহলে আমার মরণই ভাল। সুতরাং এই গাভীটিকে ছেড়ে দিয়ে আপনার ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যে আমাকেই ভক্ষণ করুন।"

এই কথা বলে রাজা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সিংহের কাছে। মাথা হেঁট করে নত হয়ে রইলেন ভূমিতলে সিংহের আক্রমণের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ তাঁর পিঠের উপর কিসের যেন কোমল-স্পর্শ অনুভব করলেন। রাজা ফিরে দেখেন রাশি রাশি ফুল। রাজার মহত্ত্ব দেখে পুষ্প-বৃষ্টি করেছেন স্বর্গ থেকে বিদ্যাধরীর দল। মধুর কণ্ঠে কে যেন রাজাকে ডাকছেন, "বৎস দিলীপ, ওঠ। আর ভয় নাই, চেয়ে দেখ আমি তোমারই সামনে তেমনি দাঁড়িয়ে আছি।"

রাজা উঠে দেখেন সিংহ অন্তর্হিত। নন্দিনী সস্নেহ চোখে প্রফুল্ল মুখে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সম্মুখে। নন্দিনী বললেন, "যা কিছু দেখলে মহারাজ, এ সব আমার মায়া ছাড়া আর কিছু নয়। আমার মায়াতেই সিংহের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি শুধু পরীক্ষা করছিলাম তোমাকে। যেমন তোমার গুরুভক্তি তেমনি তোমার আমার উপর মমতা। তোমার এই মহৎ আচরণে পরম পরিতুষ্ট হয়েছে আমার অন্তর। তুমি এখন আমার কাছে যে বর চাইবে আমি তাই তোমাকে দেব।"

রাজা দিলীপ তখন হাতজোড় করে নন্দিনীর কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন ঃ হে কৃপাময়ী মাতা নন্দিনি! আমি তোমার অধম সন্তান। রাজা হলেও আমার অন্তরে দুঃখের কালো মেঘ ঘনিয়ে আছে। যদি বর দিতে চাও মা, তবে এই বর দাও, সুদক্ষিণার গর্ভে

যেন একটি পুত্র হয়। সে পুত্র ইক্ষ্বাকুবংশের যেন গৌরব বৃদ্ধি করে। আর তার কীর্তি যেন এ পৃথিবীতে অনন্তকাল স্থায়ী হয়।

নন্দিনী আগে থেকেই এই অনুমানই করেছিলেন। রাজার প্রার্থনা শুনে তখুনি 'তথাস্তু' বলে আশীর্বাদ করলেন রাজাকে।

রাজা নন্দিনীকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফিরে এলেন। তার মুখের হাসি দেখেই মহর্ষি বশিষ্ঠ বুঝতে পারলেন রাজা নন্দিনীর বর লাভ করেছেন। সব কথা শুনে তিনিও রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। নন্দিনীর সঙ্গে গোচারণে যাওয়ার প্রয়োজন রাজার আর রইল না। পরদিন প্রাতে গুরুদেবের স্তুতি আরাধনা করে মুনিঋষিদের নানাভাবে আপ্যায়ন করে গুরুপত্নী অরুন্ধতী ও কামধেনু নন্দিনীকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন ও প্রদক্ষিণ করে রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণা পরম সন্তুষ্ট মনে ফিরে এলেন আবার রাজধানীতে।

রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণাকে অযোধ্যায় ফিরে আসতে দেখে প্রজারা তো আনন্দে অস্থির। রাজ্য জুড়ে উৎসব চলল। প্রায় দশমাস পরে যখন রাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন তখন রাজ্য জুড়ে উৎসব ও আনন্দের বন্যা বয়ে চলল। রাজা তখনই জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠালেন, তারা এসে নবজাতকের জন্মলগ্ন বিচার করে বললেন, "মহারাজ, আপনার এ পুত্র সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হবে। এমন সুলক্ষণ আমরা কোথাও দেখি নি। এই নবজাতক নিশ্চয় দেবতাদের আশীর্বাদ বহন করে এনেছে। দেখছেন না কী রূপ আর কী সুন্দর মুখশ্রী। রূপে যেন সূতিকাঘর আলো হয়ে রয়েছে।"

রাজা দিলীপ একজন সুচিকিৎসককে রাণীর তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। সেই চিকিৎসক যাতে রাণীর ও নবজাতকের কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী রইলেন। পুত্রের

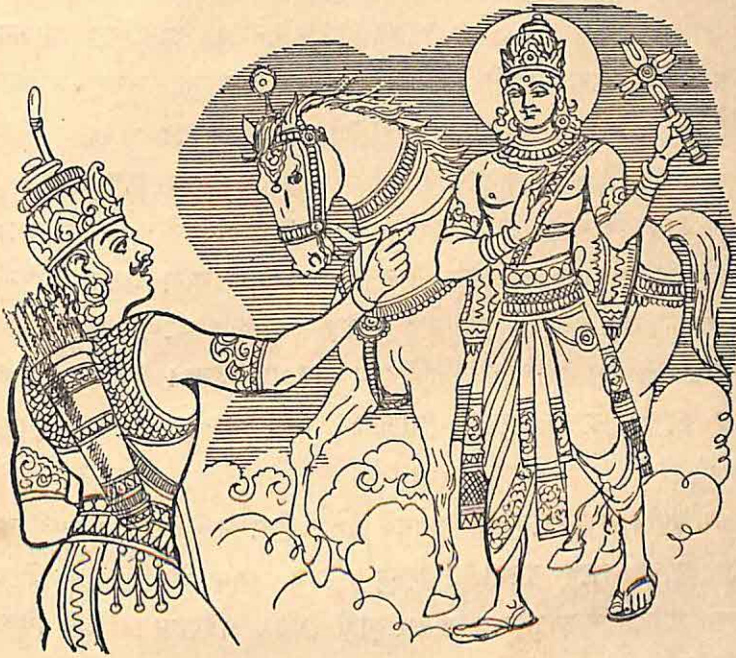
মঙ্গলকামনায় রাজা প্রজাদের মধ্যে ধনরত্ন বিতরণ করতে লাগলেন। যে-সব উৎসব প্রজারা ভালবাসে সেইসব উৎসবের ব্যবস্থা করলেন। রাজার কাছে যে যা-কিছু প্রার্থনা করলো রাজা তখনই তাকে সে জিনিস দান করলেন। রাজ্য জুড়ে আনন্দের স্রোত বইল। পূর্বে বিশেষ কোন উৎসবে রাজ্যের কারাগার থেকে কয়েদীরা মুক্তি পেত, কিন্তু রাজা দিলীপের সুশাসনে দেশে এমন কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নি যে অপরাধীরা কারাগারে থাকবে। তাই এই উৎসবে কয়েদীরা কারাগারে কেউ ছিল না বলে কয়েদী-মুক্তির কাজ আর হল না। পথে-ঘাটে সব জায়গায় প্রজারা আনন্দে কোলাহল করত আর রাজার জয়ধ্বনি দিত।

পুত্রের একটা নাম তো রাখতে হবে, তাই রাজা দিলীপ তার নাম রাখলেন রঘু। রঘু তার হাসিতে আধো-আধো কথায় ও শিশুসুলভ চপলতায় সকলকে এত খুশী করেছিল যে রাজ্য জুড়ে সকলের নয়নের মণি হয়েছিল এই রঘু। ক্রমে রঘুর বয়স বাড়তে লাগল, নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ হতে লাগল। তিনি এবার সভ্যতা-ভব্যতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা করতে লাগলেন গুরুজনদের কাছ থেকে। রঘুর শিষ্টাচার দেখে রাজা ও রাণী আনন্দে অস্থির। এত অল্প বয়সে এমন বিনয়, এমন নম্রতা ও এমন মধুর কথাবার্তা আর কোথাও দেখা যায় নি।

এইবার পাঁচ বছর বয়সে রঘুর বিদ্যারম্ভ হল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রঘু অনেক কিছু শিখে ফেলল। তার মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে শিক্ষকেরা আনন্দে অধীর ; কী তার স্মৃতিশক্তি, কী তার জ্ঞানলাভের স্পৃহা ; একবার যা-কিছু কানে শোনে কখনও তা ভোলে না। কিছুদিন এইরকম লেখাপড়ায় মন দিয়ে রঘু শাস্ত্র বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করল। রাজা দিলীপ এবার ভাবলেন রঘুকে এবার অস্ত্র-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। উপযুক্ত অস্ত্রশিক্ষকের হাতে সমর্পণ

করেও রাজা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, নিজেই তাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগলেন। শেষে রঘু অস্ত্রশিক্ষায় এমন পারদর্শী হয়ে উঠল যে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজ্যের সকল মহাবীর-যোদ্ধাই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল।

রাজা দিলীপ ভাবলেন, বয়স অল্প হলেও রাজ্যশাসন করবার ক্ষমতা রঘুর হয়েছে। তাই তিনি তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে নিজে একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার সংকল্প করলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের নিয়ম এই যে যজ্ঞের অশ্ব যে-দেশেই যাক বা যে-কোন রাজা সে অশ্ব ধরে রাখুক সেই অশ্ব উদ্ধারের জন্যে যুদ্ধ করে সেই দেশ জয় করাই যুদ্ধের নিয়ম। এইরকম একটির পর একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ হলে একশটি ঘোড়ার জয়বার্তায় হবে অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষ আহুতি। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার সঙ্গে যেতে স্বয়ং রঘু ছাড়া এত বড় বীর এ রাজ্যে আর কে আছে? তাই রাজা দিলীপ রঘুকেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার সঙ্গে দিয়ে দিগ্বিজয়ে পাঠালেন। রঘুও সব দেশ জয় করে আবার ফিরে এলেন ঘোড়াকে নিয়ে যজ্ঞস্থলে। এইরকমে অমিত-প্রতাপে রাজা দিলীপের নিরানব্বইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হল। এখন বাকী রইল শুধু আর একটি। এই যজ্ঞটি শেষ হলেই রাজা দিলীপের শত-অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হয়।



রাজা দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তখন রাজা দিলীপের কাণ্ড দেখে একেবারেই অবাক। একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে তিনি ত্রিভুবনে শতক্রতু ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। এখন দেখা যাচ্ছে রাজা দিলীপও কি জানি হয় তো একশ যজ্ঞের পুণ্যবলে স্বর্গের রাজা হতে পারেন। দেবরাজ ইন্দ্রের চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে দিলীপের একশ অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ না হয়। সুযোগও তিনি পেলেন একদিন। যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে যেতে

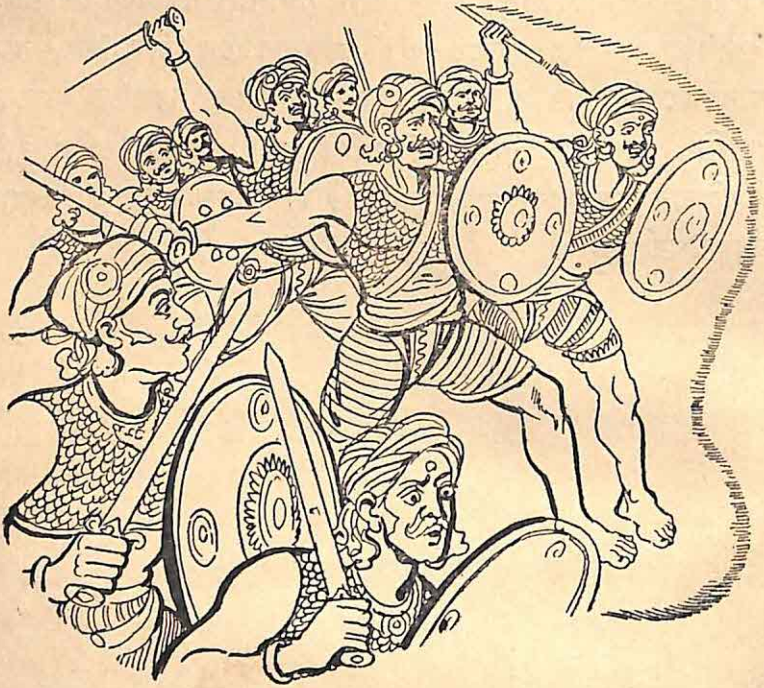
যেতে অশ্ব ছেড়ে যেই রঘু একটু দূরে গেছেন ইন্দ্র অমনি সেই ঘোড়াটিকে চুরি করে নিয়ে চম্পট দিলেন।

এদিকে রঘু ফিরে এসে দেখেন ঘোড়া নেই। চারদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন তিনি ঘোড়া পেলেন না, তখন অগত্যা চললেন বশিষ্ঠের আশ্রমের দিকে। পথে যেতে যেতে হঠাৎ নন্দিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। নন্দিনী রঘুকে দেখে স্নেহভরা চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, রঘুও যথাবিধি তাঁর অর্চনা করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করলেন। রঘুর মুখে সব কথা শুনে নন্দিনী বললেন, "বৎস রঘু, কে তোমার ঘোড়া অপহরণ করেছে তা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তিনি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। তুমি এখনই গিয়ে ইন্দ্রের কাছে যজ্ঞের ঘোড়াটি ফেরৎ পাবার জন্যে প্রার্থনা কর।"

নন্দিনীর কথা শুনে রঘু তখনই গিয়ে দেখেন—ইন্দ্র ঘোড়াটিকে নিয়ে স্বর্গের পথে রওনা হয়েছেন। রঘু তখন বীরবিক্রমে গিয়ে ইন্দ্রের সামনে দাঁড়ালেন আর ঘোড়াটি ফেরৎ চাইলেন। ইন্দ্র কিন্তু রাজী হলেন না। এইবার ইন্দ্র ও রঘুর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধল। রঘুর রণকৌশল ও বিক্রম দেখে ইন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, "যাক আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। রাজা দিলীপ আগে যে নিরানব্বইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন তার ফল একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান হবে।" ইন্দ্রের কথায় আশ্বস্ত হয়ে রঘু এবার ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে। রাজা দিলীপ রঘুর মুখে সব কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন।

এবার থেকে রাজা দিলীপ রাজ্যের মঙ্গল বিধানে যত্নবান হলেন। রঘুও পিতার সঙ্গে মন দিয়ে রাজকার্য শিখতে লাগলেন। তারপর

অনেকদিন রাজ্যশাসন করে রাজা দিলীপ স্থির করলেন তিনি বাণপ্রস্থে যাবেন। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করলে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করতে হত। এই বাণপ্রস্থে নিয়ম ছিল—বনে বাস করে ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় ও মুনিঋষিদের সঙ্গলাভে জীবনের অবশিষ্ট অংশ ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করা। রাজা দিলীপ রাণী সুদক্ষিণার সঙ্গে বাণপ্রস্থে গেলেন। রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ভার এবার রঘুর উপর পড়ল।

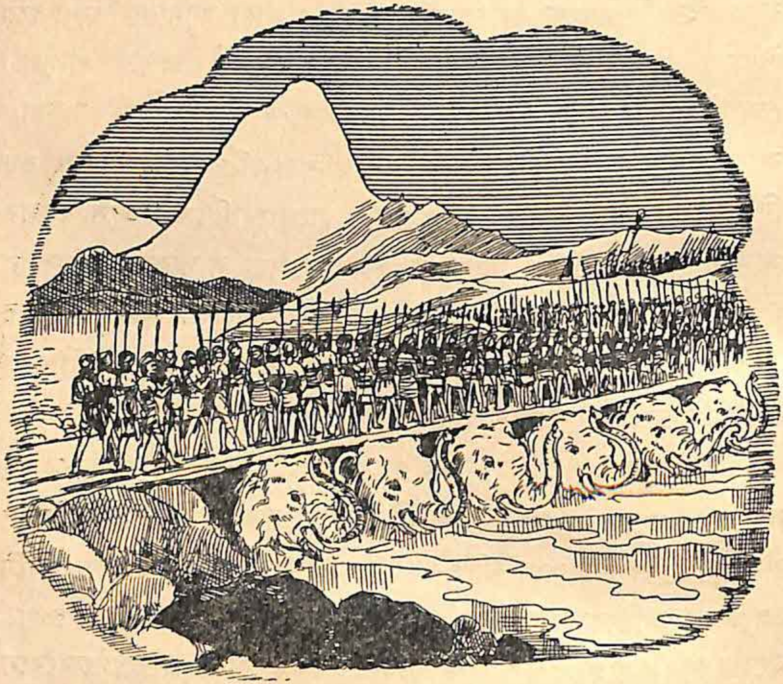


এবার রঘু হলেন রাজা

রঘুর মনে তখন জেগে উঠল আবার নূতন নূতন দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষা। একে তো মস্তবড় বীর তিনি, সৈন্যসামন্ত যথেষ্ট, ঐশ্বর্য প্রচুর। সুতরাং অন্যান্য দেশ জয় করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। যথেষ্ট সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে তুরী-ভেরী বাজিয়ে তিনি দেশজয়ে বাহির হলেন। তখন সবে বর্ষাকাল কেটেছে। শরৎকালের শোভা আরম্ভ হয়েছে। দিগ্বিজয় যাত্রার এই শুভ সময়। আগেকার রাজারা শরৎকালকেই এই বিষয়ে উপযুক্ত কাল বলে মনে করতেন।

রঘুর পূর্বপুরুষেরাও এই শরৎকালেই দিগ্বিজয়ে বার হয়েছিলেন। রঘুর এই দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা শুনে প্রজারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি চলতে লাগল। জ্যোতিষীদের ডেকে শুভদিন ও শুভলগ্ন দেখে মঙ্গলযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে আগুনে ঘৃতের আহুতি দিয়ে শঙ্খধ্বনির মাঝে রাজা রঘু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হলেন। কুলগুরু ও রাজপুরোহিতেরা এসে রাজার মাথায় ফুল ও চন্দন দিয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। তারপর রাজা যখন রাজ্যের রাজপথ দিয়ে সমরবাদ্য বাজিয়ে মহা উৎসবের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন তখন পথপার্শ্বের অট্টালিকার ভিতর থেকে পুরনারীরা তাঁর মাথায় খই বর্ষণ করতে লাগল।

কিন্তু রাজা এবার কোন্‌দিক থেকে তাঁর দিগ্বিজয় আরম্ভ করবেন? সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি স্থির করলেন আগে পূর্বদিকের রাজ্যগুলিকেই জয় করা উচিত। তাই অযোধ্যা থেকে বের হয়ে তিনি চললেন পূর্বদিকে। অনেক রাজ্যের রাজাই নিজ-নিজ রাজ্য রক্ষার জন্যে তাঁর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করল। কিন্তু শেষে হেরে গিয়ে মেনে নিলেন তাঁর বশ্যতা। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে মহারাজ রঘু উপস্থিত হলেন সুহ্মরাজ্যে। সুহ্মদেশের শক্তিও বড় কম নয়। প্রচণ্ড লড়াই চলল দুই পক্ষে। কিন্তু মহারাজ রঘুর সামনে দাঁড়ায় তখন কার সাধ্য? সুহ্মরাজ যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন।



রঘুর বঙ্গদেশ জয়

এইবার রাজা রঘু ফিরলেন বঙ্গদেশ জয় করতে। বাঙালী রাজারা দুর্বল ছিলেন না। অনেক বড়-বড় বীররাজা তখন বাঙলায় রাজত্ব করতেন। তাঁরা দেখলেন এত বড় শক্তিশালী রাজা রঘুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সহজ নয়। তবুও তাঁরা গঙ্গা নদীতে অনেক যুদ্ধতরী ভাসিয়ে রেখে রঘুকে অগ্রসর হতে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধল রঘু আর বাঙালী বীর রাজাদের সঙ্গে। রঘু তখন বুঝলেন এমন বাধা তিনি আর কোথাও পান নি। কিন্তু এ যুদ্ধে জয়লাভ করলেন রঘু। তিনি তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে একযোগে

তীব্র আক্রমণ করে বাঙালী বীরদের পরাস্ত করলেন। সমগ্র বঙ্গদেশ রঘুর অধিকারে এল। এই মহাযুদ্ধের জয়লাভের স্মৃতিস্বরূপ গঙ্গার বুকে একটি প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ নির্মাণ করে তিনি তাতে লিখে রাখলেন এই বঙ্গবিজয়ের কাহিনী। বাঙালীর বীরত্বে তিনি এতদূর মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন যে বাঙলার বীর রাজাদের হৃতরাজ্য আবার তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

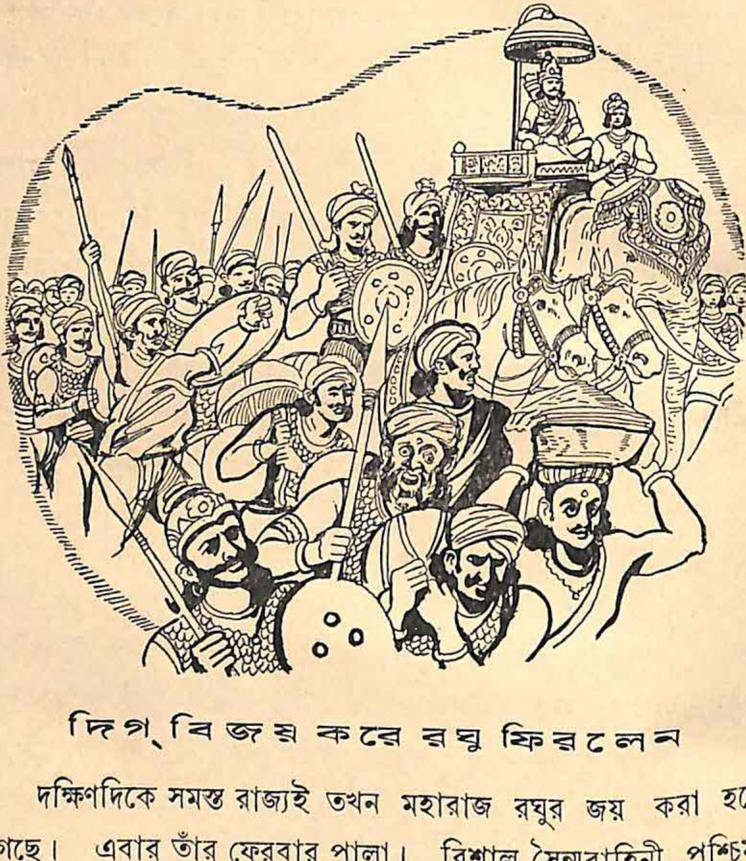
এবার রঘু সংকল্প করলেন উড়িষ্যা জয় করার। উড়িষ্যায় যেতে হলে মাঝখানে পড়ে কপিশা নদী। এই নদীর স্রোত যেমন প্রখর তেমনই তার বক্ষ বিশাল। এপার হতে ওপার প্রায় দেখা যায় না। রঘু ভাবলেন, এ নদী পার হওয়া তো সহজ নয়। সেতু নির্মাণ করে নদী পার হতে গেলে অনেক বিলম্ব ঘটবে। পথে এমন বিলম্ব করা কখনও উচিত হবে না। তখন সেনাপতি ও সমর-মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ করে তিনি স্থির করলেন—তাঁর সঙ্গে যে বিরাট রণহস্তিবাহিনী আছে, তারই হস্তীগুলিকে পাশাপাশি নদীর জলে দাঁড় করিয়ে তাদের পিঠের ওপর তক্তা পেতে অনায়াসেই তাঁর বিরাট বাহিনী নদী পার হতে পারে। যেমন সংকল্প ঠিক সেই মতই কাজ হল। গজ-সেতুর ওপর দিয়েই রঘুর বাহিনী নদী পার হয়ে উড়িষ্যা দেশে পদার্পণ করল। রঘুর আগমন-বার্তা শুনেই উৎকল রাজ্যের রাজারা কেউ আর রঘুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল না। সহজেই তারা রঘুর কাছে আত্মসমর্পণ করল। রঘু মৃদু হেসে এই ভয়ার্ত উৎকল রাজাদের অভয় বাণীতে আশ্বস্ত করে কলিঙ্গে অর্থাৎ মাদ্রাজে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। উৎকলবাসীরা তখনই রঘুকে পথ দেখিয়ে দিল কলিঙ্গে যাবার। রঘু উড়িষ্যাবাসীদের সেবায় ও আনুগত্যে পরম সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বার বার অভয় দিয়ে কলিঙ্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

কলিঙ্গ দেশের রাজারা আগেই রঘুর দিগ্বিজয়-যাত্রার কথা শুনেছিল। তারা উড়িষ্যাবাসীদের মত ভীত না হয়ে রঘুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। রঘু ভেবেছিলেন উড়িষ্যার মত তিনি অতি সহজেই কলিঙ্গ জয় করতে পারবেন। কিন্তু রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন কলিঙ্গ রাজারা তাঁকে প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করবেই। কলিঙ্গ রাজাদের প্রভূত গজসৈন্য ছিল। সেই বিশাল গজসৈন্য বাহিনী নিয়ে তারা আক্রমণ করল রঘুকে। এদিকে মহেন্দ্র-পর্বতের আদিবাসীরা নানা যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়ে কলিঙ্গদের দলে যোগ দিল। রঘু দেখলেন এইবার তাঁকে রীতিমত শক্তিপরীক্ষায় নামতে হয়েছে। কিন্তু রঘু নিরুৎসাহ হলেন না। তিনিও অমিতবিক্রমে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন কলিঙ্গের রণক্ষেত্রে। তুমুল যুদ্ধ চলল। কিন্তু রঘুর সৈন্যদের প্রচণ্ড সাহস ও অপূর্ব রণকৌশলে কলিঙ্গ সৈন্য পরাজিত হতে লাগল। মহেন্দ্রপর্বত থেকে যে-সব আদিবাসী দুরন্ত সাহসে যুদ্ধে নেমেছিল তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে দলে দলে মহেন্দ্রপর্বতে ফিরে যেতে লাগল। রঘুর সৈন্যরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে মহেন্দ্রপর্বত অধিকার করল। মহারাজ রঘু মহেন্দ্র-পর্বতেও একটি জয়স্তম্ভ স্থাপিত করে তাঁর কলিঙ্গবিজয়-কাহিনী লিখে রাখলেন।

কলিঙ্গ দেশে মহাসমারোহে মহারাজ রঘুর বিজয়োৎসব সুসম্পন্ন হল। কলিঙ্গ দেশের নারিকেলের মদ্য বিখ্যাত। সেই মদ্য পান করে বিজয়োৎসবে মত্ত হলেন রঘু। এইবার তাঁর দাক্ষিণাত্য জয়ের আকাঙ্ক্ষা হল। তিনি তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হলেন।

এবার তাঁর সামনে পড়ল কাবেরী নদী। এই কাবেরী নদীর

জলস্রোত অতি প্রবল। দুই পাশে খাড়া পাহাড়। এ নদী অতিক্রম করা সহজ নয়। কিন্তু সেদেশের রাজারা যুদ্ধ না করেই রঘুর কাছে বন্ধুত্বের প্রার্থনা নিয়ে এগিয়ে এলেন ও সহজেই বশ্যতা স্বীকার করলেন। তাঁদেরই সাহায্যে রঘু কাবেরী নদী পার হয়ে নিশ্চিন্ত মনে আরও অগ্রসর হতে লাগলেন। মহীশূর পর্যন্ত সকল রাজ্য থেকেই তিনি লাভ করলেন বন্ধুত্ব। কত জিনিসই উপহার পেলেন তিনি! তার মধ্যে ছিল সমুদ্র থেকে সংগৃহীত দুর্লভ উজ্জ্বল মুক্তাবলী। রঘু আরও অগ্রসর হলেন। এবার সামনে পড়ল পাণ্ড্যরাজ্য। এখানেও অবশ্য তাঁকে যুদ্ধ করতে হল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তাঁর অধীনে এল কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র পাণ্ড্যরাজ্য। তিনি শেষে পাণ্ড্যরাজ্যের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাঁকে তাঁর সিংহাসন ফিরিয়ে দিলেন।



দিগ্‌বিজয় করে রঘু ফিরলেন

দক্ষিণদিকে সমস্ত রাজ্যই তখন মহারাজ রঘুর জয় করা হয়ে গেছে। এবার তাঁর ফেরবার পালা। বিশাল সৈন্যবাহিনী পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী ধরে এবার চলল উত্তর মুখে। বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে রঘুর সৈন্যরা চন্দন-গন্ধে আনন্দিত হল। কী বড় বড় চন্দনবন! গন্ধে যেন আকাশ-বাতাস ভরে আছে! স্নিগ্ধ বাতাসে সেই চন্দন-গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সামনেই পড়ল যে পাহাড় তাতে শুধু চন্দনেরই গাছ। রাজা রঘু জানলেন—এ পাহাড়ের

নাম মলয় পর্বত। এই মলয় পর্বত পার হয়ে রঘু দেখতে পেলেন দোদ্‌র্র পর্বত। সে পর্বতের শোভাও অতুলনীয়। এইরূপে বনের ছায়ায়-ছায়ায়, পাহাড়ের কোলে-কোলে অবাধগতিতে অগ্রসর হয়ে রাজা রঘুর সৈন্যেরা যেন দ্বিগুণ বলসঞ্চয় করল। এই পর্বতশ্রেণীর পরেই এল কেরল রাজ্য। এখানে যুদ্ধ বাধল তাঁর কেরলরাজের সঙ্গে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কেরলরাজ প্রচণ্ডভাবে বাধা দিলেন রঘুকে। কিন্তু রঘুর সৈন্যরা নববলে বলীয়ান হয়ে কেরল-সৈন্যদের আক্রমণ করল। তারা সে আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিল। তখন রঘু মত্ত-সিংহের ন্যায় সদর্পে কেরল দেশ জয় করলেন।

কেরলদেশ জয় করবার পর রঘু এবার চললেন গুজরাট জয় করতে। গুজরাটের আর এক নাম গুর্জর। কিন্তু পর পর গুর্জর ও গুর্জরের পাশাপাশি অন্যান্য দেশ জয় করে রঘু ভাবলেন আর একটু গেলেই তো পারস্য দেশ পাওয়া যায়। সেটাকেও জয় করে আসি না কেন? এবার চললেন রঘু পারস্য জয় করতে। পারস্য দেশের তখন রণশক্তি খুব। বিশেষতঃ তার অশ্বারোহী সৈন্য অত্যন্ত রণনিপুণ ও দুর্ধর্ষ। কিন্তু রঘু পারস্য দেশ সম্বন্ধে ভিতরে-ভিতরে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করলেন। পারস্যের সঙ্গে তখন ভারতবর্ষের নানা বিষয়ের বাণিজ্য চলত, জিনিসের আদান-প্রদানও যথেষ্ট হত; জলপথে ও স্থলপথে ভারতের ব্যবসায়ীরা সেদেশে বাণিজ্য করতে যেত। কাজেই পারস্য সম্বন্ধে অনেক গোপন সংবাদ সংগ্রহ করলেন রঘু। তিনি ভাবলেন, পারস্যের অশ্বারোহী সৈন্যদের পরাজিত করতে হলে বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন।

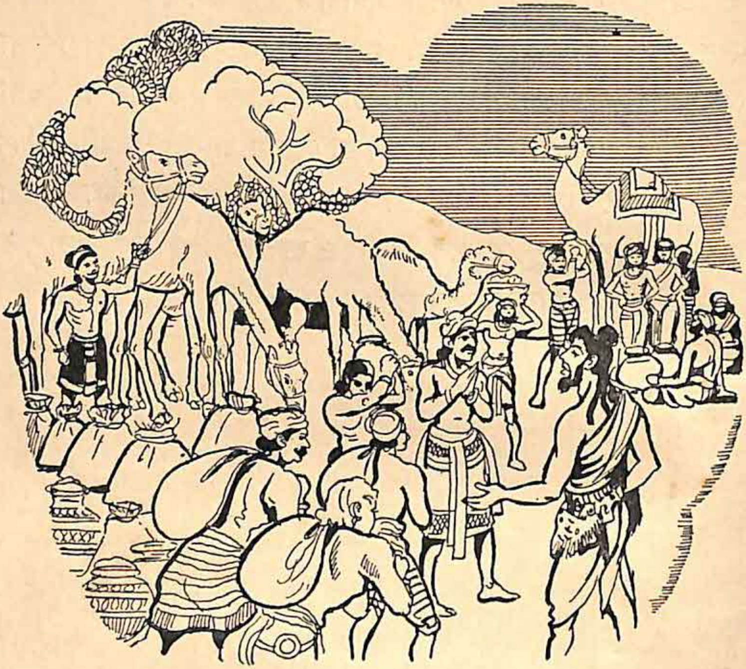
বিপুল সৈন্যদল নিয়ে রঘু পারস্যদেশে অভিযান করলেন।

পারস্যরাজ যথাশক্তি রঘুকে বাধা দিতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু রঘু সে যুদ্ধে দীর্ঘবর্শাধারী সৈন্য নিযুক্ত করে পারস্যের প্রচণ্ড অশ্বারোহী সৈন্যদের অতি সহজেই পরাস্ত করলেন। আফগানিস্তানের মধ্য দিয়েই রঘু পারস্যে গমন করেছিলেন। তখন আফগানিস্তানকে গান্ধারদেশ বলা হত। পারস্যরাজ যখন পরাজয় স্বীকার করলেন, তখন রঘু আর পশ্চিমদিকে অগ্রসর না হয়ে এবার কাশ্মীরের দিকে ফিরলেন। পারস্যদেশে আঙুরের মদ খুব বিখ্যাত। রঘু ও তাঁর সৈন্যদল আঙুর-ক্ষেতে প্রবেশ করে প্রাণ ভরে আঙুর ও আঙুর থেকে তৈরী মদ খেয়ে পরম পরিতোষ লাভ করলেন।

কাশ্মীর জয় করা রঘুর পক্ষে মোটেই কঠিন হল না। সেখান থেকে হুন দেশ ও কম্বোজ দেশ জয় করে তিনি এগিয়ে গেলেন চীন সাম্রাজ্যের দিকে। পথে হিমালয় পর্বতের নিকটে অন্যান্য পার্বত্য জাতিদের সংগে যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি ভাবলেন চীন সাম্রাজ্যে যাওয়া বৃথা। সেদেশ তো সহজেই জয় করা চলতে পারে। কিছুদিন আগে লংকাধিপতি রাবণ চীনদেশ জয় করেছিলেন। কাজেই চীনদেশ এখন শক্তিহীন। যুদ্ধে যদি বিপক্ষদল শক্তিশালী না হয় তাহলে সে যুদ্ধে উন্মাদনা কোথায়, আনন্দ কোথায়? তাই চীনদেশকে উপেক্ষা করে রঘু *প্রাগ্-জ্যোতিষপুর এসে উপস্থিত হলেন। প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের রাজা আগেই রঘুর বীরত্বের কথা শুনেছিলেন। এখন রঘু সেই দেশে আসাতে তিনি একরকম বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করলেন।

দিনের পর দিন এই রকম যুদ্ধ, রাজ্যের পর রাজ্য এইভাবে অধিকার, এতে রঘুর মনে কেমন যেন ক্লান্তি এসেছিল। তিনি

এবার আর কোন দেশ জয়ের চেষ্টা না করে নিজের রাজ্য অযোধ্যায় ফিরে এলেন। প্রজারা দেখল মহারাজ রঘু এসেছেন এত বিপুল ধনরত্ন নিয়ে, এত বিশাল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে নিয়ে, এত দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করে যে তাদের মনে হল সমগ্র পৃথিবীতে এমন ধনশালী সম্রাট আর কোথাও নেই। রঘুর পূর্বপুরুষেরা যে-সব ধনসম্পত্তি মণি-মাণিক্য সঞ্চয় করে রেখেছিলেন তারই তো তুলনা হয় না। তার উপর নানান্ দেশ জয় করে রঘু যে সব ঐশ্বর্য ও রত্নরাজি এনেছেন সেগুলি সব একসঙ্গে থাকতে পারে রাজকোষে সে স্থান নেই।



রঘুর বিশ্বজিৎ যজ্ঞ

রঘু এবার ঠিক করলেন এত ধনরত্ন রেখেই বা কী হবে? তার চেয়ে দান-ধ্যান করে দরিদ্রের অভাব মোচন করা যাক। তাই তিনি তাঁর সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ দান করবার জন্যে 'বিশ্বজিৎ' নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, আর যজ্ঞ শেষ হবার পর তাঁর দানব্রত আরম্ভ হল। দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ-লক্ষ দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হল রাজদ্বারে। যার যা প্রার্থনা রঘু তৎক্ষণাৎ পূরণ করতে লাগলেন। অভাবগ্রস্ত লোকেরা রাজার সাহায্য পেয়ে প্রাণ খুলে রাজার জয়ধ্বনি করতে লাগল। যে-কেউ আসুক, রাজার কাছ থেকে

তাকে শুধু-হাতে ফিরে যেতে হত না। এই দানের কথা শুনে অনেক দূরের দেশ থেকেও লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে আসতে লাগল অযোধ্যার দিকে। রাজার দান আর শেষ হয় না। হঠাৎ একদিন তিনি বুঝতে পারলেন রাজকোষ শূন্য হয়েছে। শেষে এমন দিন এল যখন রাজকোষে আর কিছুই রইল না। তখন নিজের বহুমূল্য বেশভূষাও ত্যাগ করলেন। অবশিষ্ট রইল শুধু রাজচ্ছত্র আর রাজসিংহাসন। কিন্তু এ দুটি তো দেবার নয়।

মহামুনি বরতন্তুর কৌৎস্য নামক এক শিষ্য শুনতে পেল রঘুর অসম্ভব রকম দানের কথা। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এল তাঁর কাছে। রঘুর নিয়ম ছিল কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ এলে তাঁকে সোনার থালায় পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হত। কিন্তু এখন হল বিপদ। রাজকোষ শূন্য, সোনার থালা আর পাওয়া যাবে কোথায়? অথচ পাদ্য-অর্ঘ্য দিতেই হবে। শেষে সোনার থালার বদলে মাটির থালায় কৌৎস্যকে পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হল। সে আশা করেছিল রাজা নিশ্চয় সোনার থালাই দেবেন। এখন মাটির থালা দেখে সে খুবই হতাশ হয়ে পড়ল। ভাবলে, রাজার দেখছি দান করে করে ধনরত্ন সব ফুরিয়ে গেছে, তাই একটা সোনার থালাও জোটে নি। কিন্তু কি আর করা যায়? রাজাকে কোন রকমে আশীর্বাদ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মহারাজ রঘু বললেন, "ঋষিবর, আপনি যে আমার রাজপ্রাসাদে পদধূলি দিয়েছেন এই যথেষ্ট। এতে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হয়েছি। এখন আপনি কেন এসেছেন একথা খুলে বলুন।" কৌৎস্য বলল, "কী আর বলব মহারাজ, আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি যে আমার খুব দেরী হয়ে গেছে। তাই আপনার ধনসম্পত্তি সব ফুরিয়ে গেছে। আমার মনে অনেক আশা ছিল আপনি নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূরণ করবেন।

কিন্তু এখন বুঝলাম আমার সে আশা নিষ্ফল। আমি এখন অন্যস্থানে গিয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা করি।”

রঘু ভাবলেন তাই তো। আমার কাছ থেকে ব্রাহ্মণ যদি কিছু না নিয়ে অন্যস্থানে যায় তাহলে তো আমারই দুর্নাম। তাই তিনি তার কাছ থেকে সব কথা জানতে চাইলেন। তখন কৌৎস্য বলল, “মহারাজ, বরতন্তু মুনির নাম আপনার অজানা নয়। আমি তাঁরই একজন শিষ্য। আমি আমার গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে তিনি খুব রেগে উঠে বললেন, ‘তুমি চাও আমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে? বেশ তাহলে নিয়ে এস চোদ্দকোটি স্বর্ণমুদ্রা।’ আমি তো অবাক! কিন্তু কী আর করব? গুরুদেব চেয়েছেন যখন, আমাকে তখন দিতেই হবে। ভেবেছিলাম, এত ধন মহারাজ রঘু ছাড়া আর কে দিতে পারে? তাই আপনার কাছে বড় আশায় ছুটে এসেছিলাম। এখন দেখছি আমার অদৃষ্ট নিতান্ত খারাপ, তাই শুধু হাতেই ফিরতে হল।”

রাজা রঘু কৌৎস্যের কথা শুনে বললেন, “বেশ, আপনি তিন-চারি দিন আমার প্রাসাদে অতিথি হয়ে থাকুন। যেমন করে পারি আপনার প্রার্থিত ধন আমি নিশ্চয় আপনাকে এনে দেব।”

এবার রঘু ভাবলেন, কৈলাস পর্বতে গিয়ে যদি কুবেরকে জয় করি তাহলে সহজেই এই ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারি। তিনি তখনই তাঁর বিপুল সৈন্যদলকে কুবের-রাজ্য জয় করবার জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন। কুবেরের কানেও একথা গেল।

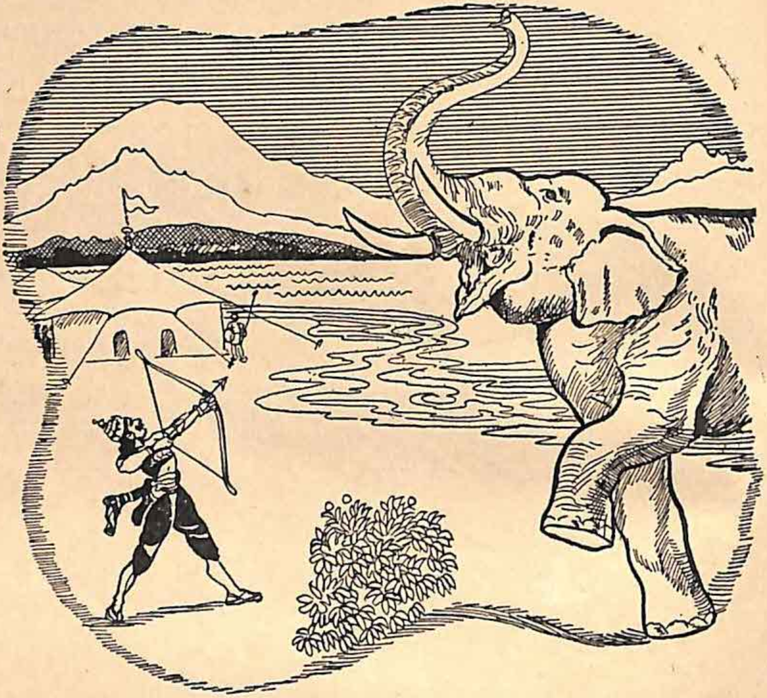
হঠাৎ একদিন রাজার কোষাধ্যক্ষ এসে বললেন, “মহারাজ, এ কী ব্যাপার? কোষাগারের দ্বারে কাল রাত্রে ক্রমাগত স্বর্ণমুদ্রা বৃষ্টি হয়েছে। চারপাশে যেন স্বর্ণমুদ্রার পাহাড়! রাজকোষে এমন স্থান নেই যে এত স্বর্ণমুদ্রা রাখা যেতে পারে।”

মহারাজ রঘু কোষাধ্যক্ষের কথা শুনে ভাবলেন, আমি যে কুবের-রাজ্য আক্রমণ করব এ কথা নিশ্চয় কুবের শুনতে পেয়েছেন। তাই ভয়ে আগে থেকেই এইসব স্বর্ণমুদ্রা অনুচর দিয়ে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাক্, আর যুদ্ধে যেতে হল না তাহলে। এবার তিনি কৌৎস্যকে ডেকে বললেন, "দেখছ তো সুবর্ণমুদ্রার পাহাড়! এখন যত ইচ্ছে নিয়ে যাও।"

কৌৎস্য তো হতভম্ব! ধীরে ধীরে বলল, "মহারাজ, আমি যা চেয়েছি তার বেশী নেব কেন? আমাকে শুধু চৌদ্দ কোটি সুবর্ণমুদ্রাই দিন।"

রাজা ভাবলেন কৌৎস্য যদি না আসত তাহলে তো এ ধন আসত না। এখন এ ধন সমস্তই কৌৎস্যের। একরকম পরের ধন বললেই চলে। তাই পরের ধন আপন বলে নেবেন কি করে?

রাজার আদেশে শত-শত উট এল, ঘোড়া এল। আর তাদের পিঠে সেই সব ধন চাপিয়ে গরীব ব্রাহ্মণ কৌৎস্যের সঙ্গে বরতন্তু মুনির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।



রঘুর ছেলে অজ

কিছুদিন পরে মহারাজ রঘুর এক পুত্র জন্মাল। রাজ্যময় এক উৎসবের স্রোত বইল। ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁর জন্ম বলে ব্রহ্মার নামের সংগে যোগ রেখে তাঁর নাম রাখা হ'ল অজ। ব্রহ্মার আর এক নাম অজ কি-না, তাই! অজের যত বয়স বাড়তে লাগল সকলে আশ্চর্য হল তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অপূর্ব মেধা দেখে। কী সুন্দর তাঁর চেহারা আর কী নম্র তাঁর স্বভাব! অল্প দিনের মধ্যেই সকলের নয়নের মণি হয়ে উঠলেন তিনি। আর তা ছাড়া যুদ্ধবিদ্যাও এমন চমৎকার শিখে ফেললেন যে লোকে ভাবতে লাগল দ্বিতীয় রঘু ইনিই হবেন।

বয়স যখন বেড়ে উঠল তখন মহারাজ রঘু তার বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। তখনকার রাজরাজড়াদের মধ্যে স্বয়ংবর বিয়েটাই বেশী চলত। অর্থাৎ রাজকন্যারা নিজের ইচ্ছামত যে-কোন রাজাকে পতিত্বে বরণ করতে পারত। এর জন্য মেয়ের বাপ মস্ত বড় সভা করে নানা দেশের রাজা ও রাজপুত্রদের আহ্বান করতেন। তাঁরা সারি সারি বসে থাকতেন আর রাজকন্যা এসে নিজের চোখে তাঁদের দেখে আর গুণের কথা শুনে তাঁদের মধ্যে একজনের গলায় মালা দিতেন।

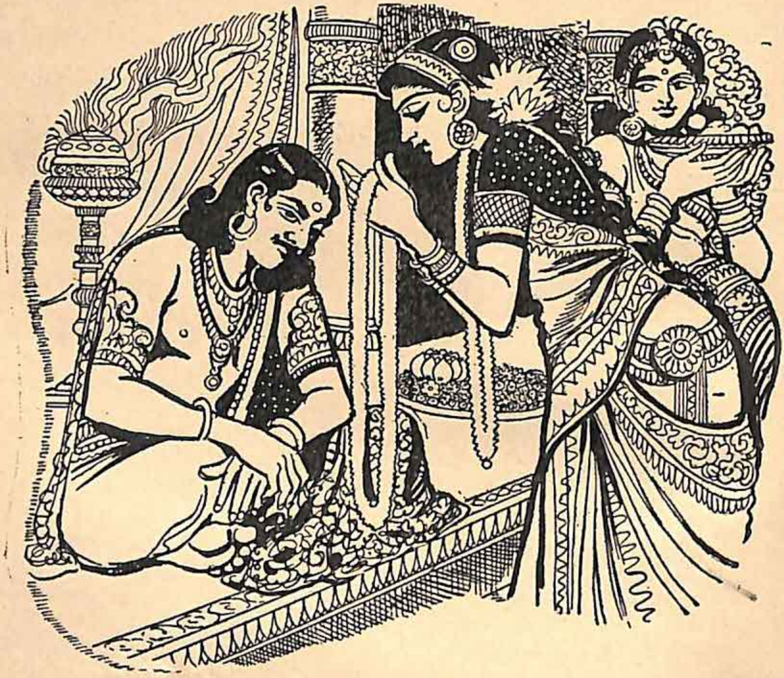
এমনি ভাবে এক খবর এল ভোজরাজের সুন্দরী ভগিনী ইন্দুমতীর জন্যে এক স্বয়ংবর সভা হচ্ছে। সে সভায় সকল দেশের রাজপুত্রেরা যোগ দেবেন, রঘু ভাবলেন: আমার ছেলে অজের বিয়ের বয়স হয়েছে। ওকেও পাঠাই সেখানে। ভোজরাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ভালই হবে। আর শুনেছি ইন্দুমতী পরমাসুন্দরী, সব বিষয়ে আমার ছেলে অজের উপযুক্ত। এই কথা ভেবেই তিনি অজকে পাঠিয়ে দিলেন স্বয়ংবর সভায়।

ভোজরাজের দেশের নাম বিদর্ভ দেশ। সেই দেশে যেতে হলে গভীর বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। বনের শোভা দেখে অজ খুবই আনন্দিত হলেন। বনের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা নদী। তার স্রোত অতি প্রখর। আর দু-পাশে সুন্দর সুন্দর সাদা পাহাড়। যুবরাজ অজ নর্মদা নদীর তীরেই তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করবার সংকল্প করলেন। তাঁর অনুচরেরাও বনের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটল। জলের ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড হাতী উঠে এসে ভীষণ বেগে অজের তাঁবুর দিকে ছুটে আসতে লাগল। হাতীর যেমন প্রকাণ্ড শরীর আর তেমনি উন্মত্তের মত আচরণ। অজের অনুচরেরা ভয়ানক ভয় পেয়ে

চারদিকে পালাতে লাগল। অজ দেখলেন সর্বনাশ! শুভকার্যে যাবার সময় এ-কী অনর্থ। বন্য হাতী বধ করা অমংগলের চিহ্ন। কিন্তু উপায়ও তো নেই। এ হাতীকে বধ না করলে মহা বিপর্যয় উপস্থিত হবে। তখন তিনি হাতীর কানে শর নিক্ষেপ করলেন। শর গিয়ে হাতির কান বিদ্ধ করল। ঠিক সেই মুহূর্তে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। অমন যে প্রচণ্ড মত্ত হাতী সে যেন কোথায় অন্তর্ধান করলো আর তার জায়গায় দেখা দিল এক সুন্দরদেহ গন্ধর্ব করজোড়ে দণ্ডায়মান। এ যেন এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি! তখন গন্ধর্ব বলতে লাগল, "হে যুবরাজ, আমার নাম প্রিয়ংবদ, আমি গন্ধর্বরাজ প্রিয়দর্শনের পুত্র। মনে মনে আমার অহংকার ছিল যে আমার মত রূপবান ত্রিভুবনে আর কেউ নেই। মহর্ষি মতঙ্গ আমার এই অহংকার দেখে রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দেন আমি যেন এই কুৎসিত বন্য হাতীর দেহ প্রাপ্ত হই। আমি তখন ভীত হয়ে তাঁর কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করতে লাগলাম। তিনি তখন বললেন, 'যদি কোনদিন সূর্যবংশের মহারাজ রঘুর পুত্র অজ তোর অংগে শর নিক্ষেপ করে তবেই তোর এ অভিশাপ মোচন হবে, তুই আবার তোর স্বাভাবিক আকৃতি ফিরে পাবি।' আমি নর্মদা জলে থাকবার সময় শুনতে পেলাম যে আপনি রাজকুমার অজ। তাই আপনার শরের আঘাত পাবার জন্যে আমি আপনার তাঁবুর দিকে ছুটে আসছিলাম। যাক্, আজ আমার অভিশাপ খণ্ডন হয়েছে। আপনি যে উপকার করলেন তার প্রতিদানে আপনাকে আমি সম্মোহন নামে এক অস্ত্রের প্রয়োগ শেখাব। এই অস্ত্র শত্রুর দেহে আঘাত করলে সে প্রাণে মরবে না বটে কিন্তু তার কোন চেতনাশক্তি থাকবে না। যুবরাজ আপনি এই অস্ত্রবলে সহজেই শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন।"

যুবরাজ অজ এই সম্মোহন-অস্ত্র লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত মনে বিদর্ভ দেশে উপস্থিত হলেন।

বিদর্ভের রাজা নিজে এসে যুবরাজ অজকে আদর করে স্বয়ংবরের জন্য নির্দিষ্ট নূতন প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সেদিন বিশ্রামলাভ করে তার পরদিন ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় তিনি যোগ দেবেন এই ঠিক হল।



ইন্দুমতীর স্বয়ংবর

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভার সৌন্দর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। মাঝখানে পথ। পথের দুই পাশে সিংহাসনে নানাদেশের রাজপুত্র একে-একে বসে আছেন। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও মণিমাণিক্যের আভায় সভা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যুবরাজ অজ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন। সভা দেখে মনে হল স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের সভাও এত সুন্দর, এত চমৎকার নয়।

সভার কাজ আরম্ভ হল। স্তুতিকারেরা সূর্যবংশীয় রাজাদের

কীর্তিকাহিনী গান গেয়ে প্রচার করলেন। তার পরেই দেখা গেল সুন্দরসাজে সুসজ্জিতা হয়ে পাল্কীতে চড়ে ইন্দুমতী সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর সংগে সখী সুনন্দা ও বৃদ্ধা ধাত্রী রয়েছে। ইন্দুমতী একা মালা হাতে নিয়ে রাজপুত্রদের পাশ দিয়ে চলতে লাগলেন। প্রত্যেক রাজপুত্রের বংশপরিচয় ও কীর্তিকথা শুনে তার দিকে একবার চেয়ে ইন্দুমতী আবার অগ্রসর হলেন। এমনি পর পর বহু রাজপুত্রের বংশকথা শুনে ও তাদের চেহারা দেখে ইন্দুমতী তাদের মধ্যে কাউকে পতিত্বে বরণ করতে ইচ্ছা করলেন না। শেষে আরও এগিয়ে গেলেন। গভীর রাত্রের অন্ধকারে রাজপথে কেউ যদি প্রদীপ হাতে করে যায় তখন সেই প্রদীপের আলোতে যখন যে অট্টালিকা সামনে পড়ে সেইটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আবার সেটিকে ছাড়িয়ে গেলেই তার উজ্জ্বলতা কমে গিয়ে অন্ধকারে ডুবে যায়। রাজপুত্রদেরও ঠিক সেই দশা হল। ইন্দুমতী যখন যে রাজপুত্রের সামনে যাচ্ছেন আশায় আনন্দে তার মুখ তখনই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কিন্তু পরক্ষণেই যখন তিনি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন সেই রাজপুত্রের মুখ দুঃখে ও নৈরাশ্যে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এবার ইন্দুমতী যুবরাজ অজের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যুবরাজের বংশকথা ও কীর্তিকাহিনী শুনে তাঁর দিকে চেয়ে ইন্দুমতী চমকে উঠলেন। এত রূপ কি মানুষের হয়! এ যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়! একে যেন তিনি কোনদিন ভুলতে পারেন নি। একেই যেন তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। এরই কথা যেন মনে-মনে ভেবেছেন। আজ ইন্দুমতীর স্বপনের ধন, কামনার সখা, অন্তরের প্রিয়জন তার সামনে উপস্থিত। এ শুভলগ্ন কি ছাড়া যায়! ইন্দুমতী স্থির হয়ে যুবরাজ অজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। সখী সুনন্দা তাঁর

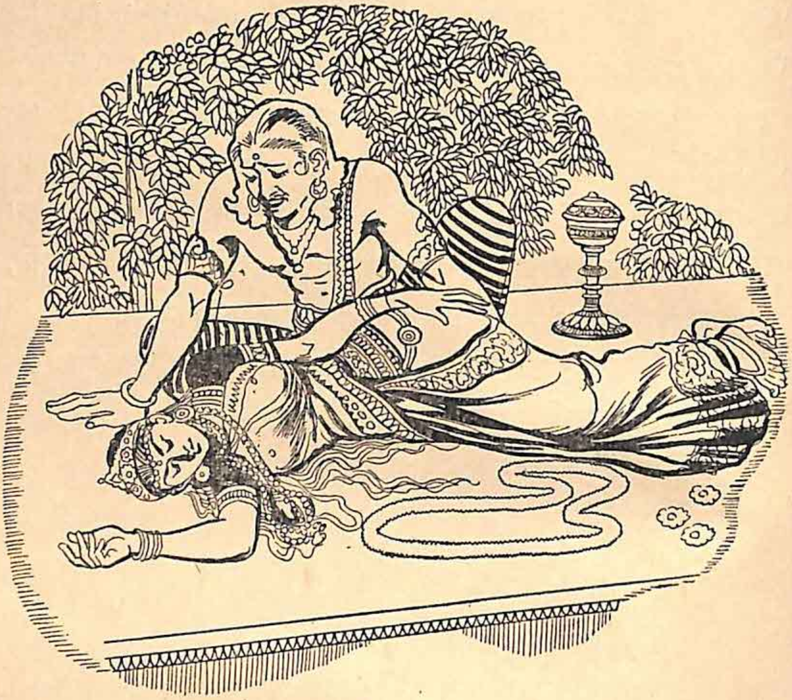
মনের কথা বুঝে রাজকুমারীর হাত ধরে নিয়ে গেলেন যুবরাজের আরো কাছে, তারপর ইন্দুমতী লজ্জায় অভিভূতা হয়ে হাসিমুখে বরণমালা পরিয়ে দিলেন যুবরাজ অজের গলায়। চারদিকে তখনই মংগল শঙ্খ বেজে উঠল, আনন্দ-কলরব ছড়িয়ে পড়ল। ইন্দুমতী ও অজ পাশাপাশি দাঁড়ালেন।

হাতীর পিঠের উপর চড়ে অজ ও ইন্দুমতী রাজ-অন্তঃপুরে ফিরে গেলেন। পথের তুই পাশে রাজবাড়ীর বারান্দা থেকে পুরকন্যারা সোনার চিক সরিয়ে আনন্দে অধীর হয়ে অজ ও ইন্দুমতীকে দেখতে লাগলেন। বর আসছে শুনে বাড়ীর মেয়েরা এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল যে কারুর এক চোখে কাজল আছে, এক চোখে নেই : কারুর এক পায়ে আলতা অন্য পায়ে নেই ; কেউ ভাল করে কাপড় না-পরে আলুথালু বেশে ছুটে এসেছে। তাদের কাছে যেন সংসারের সবকিছু মিথ্যে, শুধু বরকণেই সত্যি।

রাজ-অন্তঃপুরে পৌঁছে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহের সব কিছু সুসম্পন্ন হল। অজ ও ইন্দুমতী তখন বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করলেন। কিন্তু এদিকে আর এক বিভ্রাট। যে-সব রাজাদের ইন্দুমতী স্বয়ংবর সভায় পছন্দ করেন নি তারা তো চটেই আগুন। সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করে স্থির করল অজ ও ইন্দুমতী যখন অযোধ্যায় ফিরবেন সেই সময় সেই রথ আক্রমণ করে তাদের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। হলও তাই। বিদর্ভ ছাড়িয়ে প্রান্তরের পথে পড়তেই চারদিক থেকে এই সব রাজপুত্রের দল আক্রমণ করল অজকে। ইন্দুমতী খুবই ভয় পেলেন কিন্তু অজ তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁদের সংগে ভীষণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। এক দিকে অগণিত প্রতিহিংসায় উন্মত্ত রাজপুত্রের দল, আর এক দিকে অজ

একাকী। কিন্তু অজ ভাবলেন, এমন শুভদিনে যুদ্ধ করে রক্তে মাটি ভিজিয়ে লাভ কি। তার চেয়ে গন্ধর্বের দেওয়া সেই সম্মোহন-অস্ত্র ছেড়ে এদের সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন। এই ভেবে তিনি তখনই তাদের উপর সম্মোহন-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর বিপক্ষ দলের সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। তাদের এই অবস্থা ইন্দুমতীকে দেখিয়ে অজ বললেন, "দেখলে তো, এইসব বীরপুরুষদের কী অবস্থা করেছি।"

ইন্দুমতী তখন হেসে বললেন, "জগতে তোমার মত বীর আর কে আছে? আজ আমি স্বচক্ষে তোমার বীরত্ব দেখলাম।"



অজ ও ইন্দুমতী এলেন অযোধ্যায়

রথ আবার অযোধ্যার পথে এগিয়ে চলল।

রঘু আগেই খবর পেয়েছিলেন যে স্বয়ংবর-সভায় ইন্দুমতী অজের গলায় মালা দিয়েছেন আর তারা দুজনে বিবাহের পর অযোধ্যার দিকে আসছেন। তিনি তখন লোক-জন সৈন্যসামন্ত সংগে নিয়ে পথে এগিয়ে গিয়ে মহা ধূমধামের সংগে অজ ও ইন্দুমতীকে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। অযোধ্যা ভরে মহা ধূমধাম চলল। দিনের পর দিন আমোদ-আহ্লাদে অযোধ্যাবাসীরা যেন পাগল হয়ে উঠল। এমন ধূমধাম অযোধ্যায় আর কেউ কখনও দেখে নি।

এবার মহারাজ রঘু ভাবলেন, আর কেন! অনেকদিন তো রাজত্ব করলাম। এখন পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে, পুত্রবধূ ইন্দুমতীর উপর সংসারের ভার দিয়ে বাণপ্রস্থে যাওয়াই ভাল। কিন্তু অজ সে কথা শুনে বালকের মত কেঁদেই আকুল। পিতাকে ছেড়ে অজ একদণ্ড থাকতে পারেন না। আর তা ছাড়া, জগতে সুপরামর্শ দেবার লোকই-বা আর কে আছে? অজের কাকুতি-মিনতি দেখে রঘু ভাবলেন, এমন অবস্থায় অজকে ছেড়ে যাওয়া তো উচিত নয়। রাজধানীর কাছে এক নির্জনস্থানে থাকাই ভাল। সেখানে অজের সংগে দেখাসাক্ষাৎও হবে আর বাণপ্রস্থের কাজও হবে। এই কথা ভেবে মহারাজ রঘু রাজধানী ছেড়ে গিয়ে কাছাকাছি সন্ন্যাসীর বেশে পরমাত্মার চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন।

কিছুদিন এইভাবে কাটাবার পর মহারাজ রঘু দেহত্যাগ করলেন। অজ মহা আড়ম্বরে পিতার শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করলেন। শাস্ত্রমতে বাণপ্রস্থ অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীর দেহ মৃত্যুর পরে ভস্মীভূত করতে নেই। তাই অজ মহারাজ রঘুর দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করলেন।

কিছুদিন পরে অজ ও ইন্দুমতীর একপুত্র জন্মিল। অজ তার নাম রাখলেন দশরথ। একদিন দশরথ খেলা করতে করতে একটু দূরে গেছেন আর তখন বাগানের মধ্যে একটি পাথরের বেদীতে বসে অজ ও ইন্দুমতী নির্জনে প্রেমালাপ করছেন সেই সময়ে আকাশপথে দেবর্ষি নারদ কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁর বীণাতে একগাছি স্বর্গের পারিজাত-মালা জড়ানো ছিল। আকাশপথে যেতে যেতে সেই মালাখানি কেমন করে বীণা থেকে খুলে খসে পড়ল ইন্দুমতীর গায়ে। ইন্দুমতী শুধু একবার মালার দিকে চেয়েই তখনই ঢলে পড়লেন সেই

বেদীর উপর। অজ ইন্দুমতীর এই অবস্থা দেখে করুণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন। ইন্দুমতীর দেহ পরীক্ষা করে তিনি বুঝলেন যে ইন্দুমতী মৃতা। একটি ফুলের মালা গায়ে লাগলে যে মৃত্যু ঘটতে পারে তা তিনি জানতেন না। কিন্তু এ মালা তো সাধারণ মালা নয়। এ যে স্বর্গের পারিজাত মালা। যে-ইন্দুমতীকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন, যে-ইন্দুমতীকে না দেখতে পেলে অস্থির হয়ে উঠতেন সেই ইন্দুমতী আজ তার সামনে মরণের কোলে ঢলে পড়েছে। ইন্দুমতী ছিল মহারাজ অজের অন্তরের সর্বস্ব ধন। সেকালে রাজাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও রাজা অজ ইন্দুমতী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করেন নি। ইন্দুমতী ছিলেন রাজার সবকিছু, তাঁর গৃহিণী, তাঁর মন্ত্রী, তাঁর বন্ধু, তাঁর সঙ্গিনী আর তাঁর প্রিয় শিষ্যা। পৃথিবীতে ইন্দুমতী যদি না থাকে তাহলে অজেরও থাকার প্রয়োজন কি? তবে কি ইন্দুমতীর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তিনি তাঁর এ মর্ম-জ্বালা জুড়োবেন? কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ। এতে যশের চেয়ে অপযশই বেশী। তাই তিনি এ কাজ করলেন না।

ইন্দুমতীর শ্রাদ্ধাদি শেষ হয়ে গেলে অজ আবার রাজকার্যে মন দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাজকার্য তাঁর আর ভাল লাগল না। ইন্দুমতীর সেই হাসিমুখখানি সবসময়েই তাঁর মনে পড়তে লাগল। তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠ ইন্দুমতীর অকাল মৃত্যুর কারণ যোগবলে জানতে পেরে অজকে বললেন: বৎস, ইন্দুমতীর জন্য আর শোক করে লাভ নেই। সে ছিল হরিণী নামে এক স্বর্গের অপ্সরা। ইন্দ্রের আদেশে তৃণবিন্দু নামে এক ঋষির তপোভংগ করতে গিয়ে সেই ঋষির অভিশাপে মর্ত্যে মানবী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই অপ্সরাই এই ইন্দুমতী। হরিণী-অপ্সরা অনেক কাকুতি মিনতি করবার

পর তৃণবিন্দু ঋষি তাঁকে বললেন: 'আচ্ছা বেশ, তোমার অভিশাপ মোচন হবে তখন যখন তুমি মর্ত্যে থেকেও কোনও স্বর্গের ফুল চোখে দেখতে পাবে।' নারদের বীণায় ছিল স্বর্গের ফুল পারিজাত। সেই ফুলকে চোখে দেখে ইন্দুমতীরূপধারিণী অপ্সরা হরিণীর অভিশাপমুক্তি ঘটেছে। সে আবার স্বর্গে ফিরে গেছে। এখন আর অকারণ শোক করে লাভ কি?

বশিষ্ঠের সান্ত্বনা বাক্যেও অজের মন থেকে শোকের ছায়া সরে গেল না। তিনি ইন্দুমতীকে কোন সময়েই ভুলতে পারলেন না। তাঁর মনে না রইল সুখ-শান্তি, না রইল কোন সান্ত্বনা। শেষে আর ইন্দুমতীর বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি অনশনে দেহত্যাগ করবার সংকল্প করলেন। তাই তাঁর পুত্র দশরথকে তাড়াতাড়ি সিংহাসনে বসিয়ে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। তারপর ইন্দুমতীর কথা ভাবতে-ভাবতে পুণ্যসলিলা গঙ্গা ও যমুনার সংগম-তীর্থে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে পরলোকে আবার ইন্দুমতীর সংগে মিলিত হবার জন্যে আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে বরণ করলেন।

অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসলেও দশরথের বয়স তখন অল্প। কিন্তু সাধারণতঃ অল্প বয়সের ছেলেরা যেমন আমোদ-প্রমোদে মেতে ওঠে, বিলাস-ব্যসনে দিন কাটায়, রাজা হয়েও দশরথ তেমন কিছু করলেন না। তাঁর সর্বদাই মনে এই চিন্তা হতে লাগল কেমন করে তাঁর বংশের গৌরব বজায় থাকবে। তাই তাঁর পূর্বপুরুষের মতই তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে রাজকোষের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করলেন। তাঁর পিতামাতা তখন কেউই নেই। বৃদ্ধ অমাত্যেরা সকলে মিলে পরামর্শ করে তাঁর বিয়ে দিলেন কোশল, কেকয় ও মগধ রাজ্যের তিনটি পরম রূপবতী রাজকন্যার সংগে। বেশ আনন্দেই রাজার দিন

কাটতে লাগল, রাজ্যও নিরাপদ। কিন্তু হঠাৎ আহ্বান এল তাঁর স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের কাছ থেকে। সেখানে অসুরেরা নানারকম উৎপাত করে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। ইন্দ্র তো আছেনই, তার সংগে যদি রাজা দশরথের মত মহাবীর যোগ দেন তাহলে অসুরদের জব্দ করা খুব সহজ হয়। হলও তাই। স্বর্গ থেকে ফিরে এসে মহারাজ দশরথ এবার সম্পন্ন করলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ। চারদিকে তাঁর সুখ্যাতির অন্ত নেই। সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছেন তিনি, কিন্তু রাজার যে একটা কাজ যুদ্ধ করা, সেটা তো আর হয়ে উঠছে না। আর যুদ্ধই বা করবেন তিনি কার সংগে? সব দেশের সব রাজাই তো তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে। ধনুর্বাণ অস্ত্রাদি সব একপাশে পড়ে আছে। তখন দশরথ ভাবলেন, তবে না হয় বনে মৃগয়াতেই যাওয়া যাক। এই কথা ভেবে গভীর বনে রাজা দশরথ চললেন মৃগয়ায়। অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে বিশেষ কোথাও শিকারের জন্তু পেলেন না। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল একটি হরিণ ও হরিণী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মনের সুখে খেলা করছে। রাজা তখন হরিণকে উদ্দেশ করে যেমনি শর নিক্ষেপ করতে যাবেন অমনি হরিণী সরে এসে হরিণের দেহ আড়াল করে দাঁড়িয়ে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রাজা চমকে উঠলেন। বন্য পশুদের মধ্যে এমন গভীর প্রেম দেখে রাজার হাত থেকে তীর-ধনুক খসে পড়ল। করুণায় বিগলিত হয়ে রাজা মৃগয়া করলেন না। তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন।

মন্ত্রীরা মৃগয়ার কথা শুনে তো অবাক। তারা বললেন, "মহারাজ, আপনার মত মহাবীর, মারতে গেলেন কি-না এক শান্ত প্রকৃতির হরিণ। এসব নিরীহ জীবজন্তু না বধ করে আপনি বরং বাঘ ভাল্লুক

সিংহ গণ্ডার—এইসব মারতে আরম্ভ করুন। মন্ত্রীদের কথা শুনে রাজা ভাবলেন, তাই তো! মৃগয়া করতে হলে এই সব জন্তুই শিকার করা উচিত। তখন আবার তিনি নূতন উদ্যমে বনে মৃগয়া করতে গেলেন।



দশরথের সিন্ধুবধ

রাজা দশরথের অনেক রকম আশ্চর্য অস্ত্রই জানা ছিল। তার মধ্যে একটি হল শব্দভেদী বাণ। দূর থেকে শব্দ শুনে অনুমান করে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করলে যেখানে শব্দ হচ্ছে সেই বাণ সেখানে গিয়ে আঘাত করবে। দশরথ গভীর বনে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলেন কোন হিংস্র জন্তুই তাঁর সামনে এসে পড়ছে না। তখন হঠাৎ শুনতে পেলেন হাতীর জলপানের মত শব্দ হচ্ছে। আর বিলম্ব না-করে সেই শব্দ লক্ষ্য করে তিনি নিক্ষেপ করলেন তাঁর শব্দভেদী বাণ।

তিনি ভেবেছিলেন ও-রকম শব্দ জলপানের সময় হাতীরাই করে। তাই সেই অদৃশ্য হাতীটাকে মারবার জন্যে তিনি ছুড়েছিলেন শব্দভেদী বাণ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁর কানে এল এক করুণ আর্তনাদ। সেই বাণে আহত হয়ে কোন মানুষ যেন কেঁদে উঠেছে। তিনি তখনই সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেলেন।

চারপাশে বেতগাছের ঝোপ। তারই পাশ দিয়ে একটা সরু পথ গেছে ঘাটের দিকে। কলসী নিয়ে ঘাট থেকে জল নিতে এসেছিল এক কিশোর মুনি-বালক। কী সুন্দর তার চেহারা! ভয়ানক ভীত হয়ে রাজা দশরথ দেখেন তাঁর সেই শব্দভেদী বাণ বিঁধেছে মুনি-বালকের বুকে। সে তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। রাজা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বালক অতি কষ্টে বলল, যে সে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নয়, জাতিতে বৈশ্য। তার পিতামাতা দুজনেই গভীর বনে তপস্যা করে, কিন্তু তারা অন্ধ। এই বালকই সেই অন্ধ পিতামাতার একমাত্র আশ্রয়। রাজা দশরথ তখন মনে মনে অনুতাপ করতে করতে বালকটিকে কোলে তুলে নিয়ে তার অন্ধ পিতামাতার কাছে এগিয়ে গেলেন।

অন্ধ পিতামাতা পুত্রের অপেক্ষায় বসেছিলেন। এখন রাজার পদশব্দ শুনে ভাবলেন, তাঁদের ছেলেই বুঝি ফিরে আসছে। কিন্তু রাজা দশরথ যখন তাঁদের সামনে মৃত ছেলেটিকে শুইয়ে দিয়ে গভীর দুঃখের সংগে সমস্ত ঘটনা বললেন তখন অন্ধমুনি ও তার স্ত্রী দুজনেই হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন। অন্ধমুনি বললেন, "মহারাজ, আপনি ভুলক্রমে এ কাজ করলেও আমাদের দুর্দশা বা শোক আপনার অনুতাপে তো শান্ত হবার নয়। আমার পুত্র আপনার কোন অনিষ্ট না করলেও আপনি তার প্রাণবধ করেছেন। এতে শুধু

আপনি আমার পুত্রের প্রাণবধ করলেন না আমাদেরও প্রাণবধ করলেন।"

রাজা যতই শান্ত করার চেষ্টা করেন অন্ধমুনির শোক ততই বেড়ে ওঠে। শেষে শোকে বিহ্বল হয়ে তিনি রাজা দশরথকে অভিশাপ দিলেন, "মহারাজ, আজ যেমন আমরা আমাদের পুত্রশোকে প্রাণ হারাতে বসেছি আপনিও তেমনি আপনার পুত্রশোকে প্রাণ হারাবেন।"

রাজা দশরথ এই দারুণ অভিশাপ শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অপুত্রক। পুত্রের মুখদর্শনের জন্যে এর আগে কত যাগযজ্ঞ, পুণ্যকাজ করেছেন কিন্তু তবুও তিনি সন্তান লাভ করতে পারেন নি। এখন মুনির অভিশাপ শুনে তাঁর মনে এত দুঃখেও একটু আনন্দের ভাব এল এই ভেবে যে মুনির শাপ কখনও ব্যর্থ হবার নয়। তাই মৃত্যুর পূর্বেও তিনি তো তাঁর পুত্রমুখ দেখে যেতে পারবেন। এ যে তাঁর কাছে শাপে বর।

রাজা দশরথ তখন মুনিকে বললেন, আপনার মৃত পুত্রের জন্য আমাকে যা কিছু করতে বলবেন আমি এখনই তা করতে প্রস্তুত। তখন অন্ধমুনি বললেন, "মহারাজ, তবে একটু বড় করে চিতা প্রস্তুত করুন। যাতে সেই চিতায় আমি ও আমার স্ত্রী দুজনে আমার পুত্রের সংগে একসাথে মরতে পারি।"

রাজা দশরথ কি করেন, তাদের আদেশ পালন করলেন। একই চিতায় তিনজনকে ভস্মীভূত করে পরম দুঃখিত মনে তিনি ফিরে এলেন অযোধ্যায়। প্রতিজ্ঞা করলেন আর কোনদিন মৃগয়া করবেন না।



লঙ্কার রাজা রাবণের অত্যাচার

রাক্ষসরাজ রাবণ ছিল লঙ্কাদেশের অধীশ্বর। এত বড় বীর তখন ত্রিভুবনে আর কেউ ছিল না। কোন মানুষ-রাজা তো তার সংগে যুদ্ধে পেরে উঠতেন না। এমন কি দেবতারাও বার বার তার হাতে পরাজিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়—রাবণ স্বর্গে গিয়ে বহুবার দেবতাদের ঐশ্বর্য ও স্বর্গের সুন্দরী অপ্সরীদের ধরে নিয়ে এসেছিল। দেবতারা রাবণকে হারাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন অনেক। কিন্তু ব্রহ্মার বরে রাবণকে কেউ যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারতেন না। বারবার

হেরে গিয়ে দেবতারা তখন বিষ্ণুর কাছে নিজেদের দুঃখের কাহিনী জানালেন। নারায়ণ তখন শুয়েছিলেন ক্ষীরোদ-সমুদ্রের উপর। সর্পরাজ বাসুকির কুণ্ডলিত দেহের উপর পাতা ছিল তাঁর শয্যা। তাঁর পায়ের কাছে লক্ষ্মীদেবী বসে পদসেবা করছেন। সেই অবস্থায় নারায়ণকে পেয়ে তাঁরা জুড়ে দিলেন পরম পুরুষের স্তব। শয্যায় শুয়ে শুয়ে নারায়ণ সেই স্তব শুনে খুবই পরিতুষ্ট হয়ে দেবতাদের বললেন, "দেবগণ, তোমরা যে রাক্ষসরাজ রাবণের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে আমার করুণা ভিক্ষা করতে এসেছ—এটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সেই দুরাচার রাবণকে আর বেশিদিন এভাবে দুষ্কার্য করতে হবে না। তোমাদের অন্তরের আকিঞ্চনে আমি শীঘ্রই যাব মর্তলোকে ; জন্ম নেব অযোধ্যার রাজা দশরথের গৃহে তাঁরই পুত্ররূপে। তারপর আমি বধ করব রাবণকে। তোমরা এখন যাও। যা-করবার আমিই তা করব।"

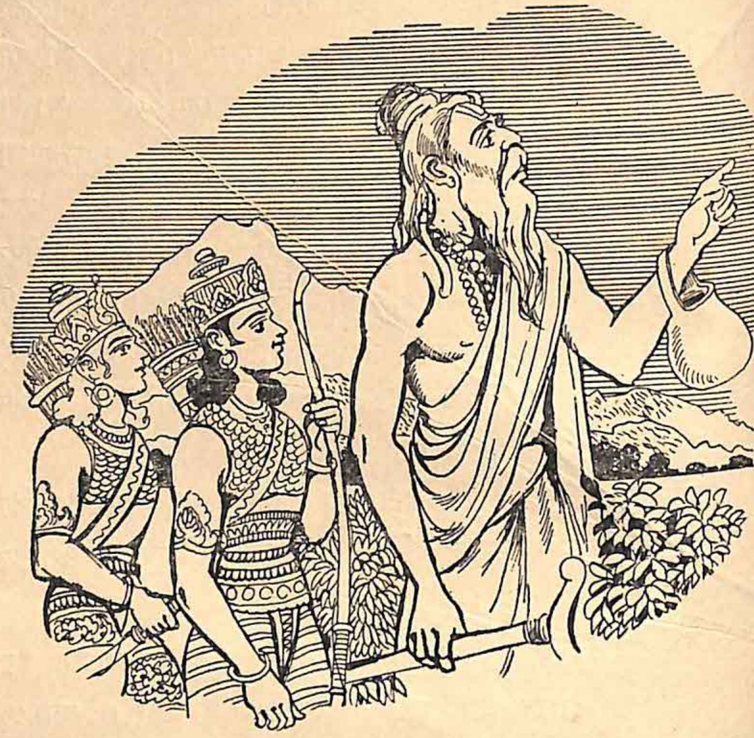
দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে আবার স্বর্গে ফিরে গেলেন। নারায়ণ যে নরলোকে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে ও রাবণ বধ করে দেবতাদের নির্ভয় করবেন—এই কথাই স্বর্গে প্রচারিত হল।

রাজা দশরথ অপুত্রক থেকে ভবিষ্যতের চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন। বয়স তো বেড়েই চলেছে তাঁর। কবে আর পুত্রমুখ দেখতে পাবেন? তাই এবার তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠকে ডেকে 'পুত্রেষ্টি' নামক যজ্ঞ করবার পরামর্শ গ্রহণ করলেন। বশিষ্ঠের নির্দেশে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে করা হল এ যজ্ঞের পুরোহিত। রাজা তাঁর তিন রাণী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে নিয়ে যজ্ঞস্থলে বসে একমনে আরাধনা করতে লাগলেন যজ্ঞেশ্বরের,—যাতে তিনি তাঁদের পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। সেই সময়ে দেখা গেল

যজ্ঞের অগ্নিশিখা আরও দীর্ঘ ও আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর যজ্ঞাগ্নির মধ্যে এক স্বর্গীয় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তাঁর এক সুবর্ণময় পাত্র। রাজা দশরথকে ইংগিতে আহ্বান করতেই তিনি উঠে গিয়ে সেই সুবর্ণপাত্র গ্রহণ করে দেখলেন তার মধ্যে রয়েছে এক পরম সুগন্ধি স্বর্গীয় পায়সান্ন। তিনি তখন কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নির্দেশে সেই পায়সান্ন তাঁর তিন রাণীকে খাওয়ালেন। তিন রাণীর মধ্যে ছোট ছিলেন সুমিত্রা। বড় রাণী কৌশল্যা ও মেজ রাণী কৈকেয়ী তাঁদের পায়সান্ন থেকে একটু একটু অংশ আদর করে সুমিত্রাকে দিলেন। চারিদিকে আনন্দ কোলাহলের মধ্যে যজ্ঞ সম্পন্ন হল।

এর কিছুদিন পরেই তিন রাণী স্বপ্ন দেখলেন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে স্বয়ং নারায়ণ গরুড়ের পিঠে চড়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা দশরথ এই স্বপ্ন শুনে ভাবলেন, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ তাহলে তাঁরই ঘরে জন্ম নিতে আসছেন। আনন্দে রাজা এ স্বপ্নের কথা সকলকে জানালেন।



শ্রীরামের জন্ম

কিছুদিন পরে চৈত্রমাসের নবমী-তিথিতে শ্রীভগবান চার অংশে বিভক্ত হয়ে রামরূপে, ভরতরূপে, লক্ষ্মণরূপে ও শত্রুঘ্নরূপে ভূমিষ্ঠ হলেন। স্বয়ং নারায়ণ যখন নরদেহে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন তখন কি আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি ভয় পৃথিবীতে থাকে? সর্বত্র যেন কল্যাণ ও শান্তি বিরাজ করতে লাগল।

কিন্তু এদিকে আর এক ব্যাপার ঘটল। লঙ্কায় রাবণরাজার

সভায়, যে শুভ মুহূর্তে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন ঠিক সেই সময়ে রাবণের মাথার মুকুট মাটিতে খসে পড়ে গেল। সিংহাসন ঘন-ঘন কেঁপে উঠল। সমস্ত লঙ্কায় যেন অমংগল নেমে এল। দশানন ভাবল, এ আবার কী হল! এমন তো কখনও হয় নি। সে মনে-মনে খুবই ভয় পেল। এদিকে রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন দশরথের চার ছেলে বয়সে বড় হতে লাগলেন। তাঁরা যাতে সুশিক্ষা পান রাজা দশরথ তার ব্যবস্থা করলেন। শাস্ত্রশিক্ষা তো হলই, তার সংগে রীতিমত অস্ত্রশিক্ষা চলল। শেষে এমন হল যে অস্ত্রচালনায় তাঁদের সমকক্ষ সেদেশে একজনকেও পাওয়া গেল না। প্রজারাও তাঁদের স্বভাবগুণে খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়ল। সকলের মুখেই তখন রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের গুণের কথা। এমনই দিন যায়।

এই সময়ে রাজসভায় এলেন গাধি মুনির ছেলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র। তিনি বললেন, "মহারাজ, বনের মধ্যে আর তো যাগযজ্ঞ, ধর্মকার্য কিছুই হবার জো নেই। রাক্ষসেরা এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। দেশে আপনার পুত্র রামচন্দ্র ছাড়া এমন বীর আর কে আছে যে তাদের দমন করতে পারে। তাই সেই রাক্ষসদের বিনাশ করতে আমি ভিক্ষা করছি আপনার পুত্র রামচন্দ্রকে।" রাজা তো শুনে অবাক হয়ে গেলেন, মুনিবর এসব কথা আবার কী বলছেন! রাম তো এখনও কিশোর, এ বয়সে রাক্ষসদের বধ করা তো সোজা কথা নয়। কিন্তু বিশ্বামিত্র বললেন, "যাগযজ্ঞের বিঘ্ন-নিবারণ যিনি করতে পারেন সেই ভগবান তো জন্মেছেন আপনার ঘরে অবতাররূপে। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, রামচন্দ্র নিশ্চয়ই রাক্ষসদের বিনাশ করতে সক্ষম হবেন।"

বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনে রাজা দশরথ সম্মতি দিলেন রামচন্দ্রকে রাক্ষসবধে, কিন্তু রামের সংগে দিলেন লক্ষ্মণকে। বনের পথে চলতে রাম-লক্ষ্মণের খুবই কষ্ট হচ্ছিল। অভ্যাস তো নেই। কত কাঁটা পথে ছড়িয়ে আছে, কত লতা-গুল্ম পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, কত শাখাপ্রশাখা তাদের পথ অবরোধ করছে। তবুও তাঁরা চলেছেন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সংগে। বিশ্বামিত্র দেখলেন, সত্যই তো রাজপুত্রদের বনপথে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি তাঁদের শিখিয়ে দিলেন বলা ও অতিবলা নামে দুটি মন্ত্র। এ মন্ত্র শেখা থাকলে পথ যতই দুর্গম হোক না কেন চলতে কোন কষ্টই হয় না। তাছাড়া যাবার সময় দুভাইকে পাশাপাশি রেখে বিশ্বামিত্র এমন সব মজার-মজার গল্প বলতে আরম্ভ করলেন যে একমনে গল্প শুনতে শুনতে কতটা পথ তাঁরা চললেন তাঁরা বুঝতেই পারলেন না! তাছাড়া বনের কী সুন্দর শোভা! কোথাও পাখীরা গাছের ডালে বসে মধুর স্বরে গান গাইছে, কোথাও বা নানা রকমের ফুল ফুটে বনভূমি আলো করে রেখেছে, কোথাও বা ছোট-ছোট নদী কুলুকুলু শব্দ করে নেচে-নেচে চলেছে; ফুলের গন্ধে বাতাস কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। বনের এ-সব শোভা দেখতে দেখতে পথের ক্লান্তি যেন তাঁদের আর রইল না। শেষে তাঁরা বনের মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে ঋষিদের তপোবনের কাছে পৌঁছলেন। তাঁদের দু-ভাইকে বিশ্বামিত্রের সংগে আসতে দেখে দূর থেকে রাক্ষসেরা তেড়ে এল তাঁদের দিকে। রাক্ষসেরা মায়াচর। তাই তাদের কেউ-কেউ আকাশপথেও আসতে লাগল। মেঘের মত কালো-কালো তাদের সব ভীষণ আকৃতি দেখে রাম-লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বামিত্রকে "এরা কে?" বিশ্বামিত্র বললেন, "এরাই রাক্ষস।" রাম তখন ধনুকে তীর সংযোগ করে সজোরে তাদের দিকে তীর

ছুড়লেন। রাক্ষসদের আগে-আগে আসছিল বিকটাকার তাড়কা রাক্ষসী। তীর সোজা গিয়ে বিঁধল তার বুকে। রাক্ষসী তখন কুৎসিৎ মুখভংগী করে ভয়ানক আর্তনাদ করতে করতে রাম-লক্ষ্মণের সামনে এসে আছড়ে পড়ল। কী প্রকাণ্ড তার চেহারা! গলায় সে পরেছে নরমুণ্ডের মালা, পরণে বাঘের ছাল; কিম্ভূতকিমাকার মুখভংগী করতে করতে সে প্রাণত্যাগ করল সেখানে। তাকে মরতে দেখে অন্যান্য রাক্ষসেরা ভয়ে পালিয়ে গেল। তাড়কা রাক্ষসীকে নিধন করে তাঁরা মহামুনি বিশ্বামিত্রের সংগে চলতে লাগলেন বনের ভিতরে আরও কিছুদূর। যেতে যেতে তাঁরা পৌঁছলেন বামনাশ্রমে। এই খানেই নারায়ণ বামনরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রামচন্দ্রের মনে হল, এ স্থান যেন তাঁর কত পরিচিত, কত যেন তাঁর অতীত-স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানে। কিন্তু এসব স্মৃতি কোথা থেকে তাঁর মনে আসছে সেটা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। মনটা তাঁর খুবই খারাপ হল। কিন্তু তবুও তিনি অনেক কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগলেন। এবার তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে। শিষ্যেরা ছুটে এল পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে, কিন্তু হঠাৎ কতকগুলো রাক্ষস তাঁদের সামনে রক্ত ও মাংসের টুকরো ছুড়তে লাগল। মারিচ ও সুবাহু নামে দুজন রাক্ষস সেই রাক্ষস দলের নেতা। রামচন্দ্র তাদের দেখতে পেয়ে সুতীক্ষ্ণ তীর ছুড়ে তাদের মেরে ফেললেন। দলপতি দুজনকে মরতে দেখে অন্য রাক্ষসেরা প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

মুনিদের যজ্ঞে এতকাল রাক্ষসেরা বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল; এখন রাম লক্ষ্মণকে পেয়ে তারা ভাবল, এইবার নিশ্চিন্ত মনে যাগযজ্ঞ করা চলতে পারে। তাই বিশ্বামিত্র নিজেই এক যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।

সকলের আশীর্বাদ পেয়ে রাম-লক্ষ্মণ যেন দ্বিগুণ বলশালী হয়ে উঠলেন।

সেই বনের শেষে মিথিলা রাজ্যের আরম্ভ। মিথিলাধিপতি জনক বিশ্বামিত্রের কাছে খবর পাঠালেন যেন তিনি একটিবার তাঁর রাজ্যে পদার্পণ করেন। একটা যজ্ঞ করছিলেন রাজা জনক। সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হতে গেলে মহামুনি বিশ্বামিত্রের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। আর তা ছাড়া বিশ্বামিত্রও শুনেছিলেন, জনক রাজার কাছে এক হরধনু আছে। সেই হরধনু নড়াতে পারে, তুলতে পারে, তাতে জ্যা-সংযোগ করতে পারে ত্রিভুবনে এমন বীর আর কেউ নেই। তখন রাজা জনক ঠিক করলেন—তাঁর পরম রূপবতী কন্যা সীতার সংগে সেই মহাবীরের বিয়ে দেবেন, যিনি এই হরধনু তুলতে পারেন। হরধনু যেমন বিরাট, তেমনি ভারি, আর তেমনি অনমনীয়। সুতরাং মনের মত বীর জামাতা পাবার জন্য রাজা জনক এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বিশ্বামিত্র ভাবলেন, মিথিলায় রাজা জনকের কাছে রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে সংগে নিয়ে গেলে দোষই-বা এমন কি। তাছাড়া তাঁকে তো নিজে আবার অযোধ্যায় গিয়ে রাজা দশরথের কাছে রাম-লক্ষ্মণকে পৌঁছে দিতে হবে। আগে মিথিলায় যাওয়া যাক, তারপর অযোধ্যায় গেলেই চলবে, এই ভেবে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে সংগে নিয়ে মিথিলায় জনক রাজার যজ্ঞে উপস্থিত হতে চললেন।



শ্রীরামের অহল্যা উদ্ধার

দীর্ঘ বনের পথে বিশ্বামিত্রের সংগে দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ চলেছেন। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে তিনি তাঁদের বললেন, "এক সময়ে এস্থানে ছিল মহর্ষি গৌতমের আশ্রম। তিনি তাঁর পত্নী অহল্যার বিশেষ এক অপরাধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন 'তুমি পাষাণে পরিণত হও।' ঋষি গৌতমের অভিশাপ তো ব্যর্থ হবার নয়। তাই অহল্যা পাষাণী হয়ে গেলেন। পাষাণী হবার আগে অহল্যার কাতর আবেদনে তিনি বলেছিলেন, "যদি কোনদিন ভবিষ্যতে এই পাষাণের

উপর শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শ ঘটে তবেই তোমার অভিশাপ মোচন হবে, তুমি আবার তোমার পূর্বরূপ ফিরে পাবে।"

রামচন্দ্রের সামনে অহল্যার পাষাণ-মূর্তি পড়ে আছে। বিশ্বামিত্র বললেন, "পাষাণকে তোমার চরণ দিয়ে স্পর্শ কর রামচন্দ্র।" রামচন্দ্র তাই করলেন। সংগে সংগে পাষাণমূর্তি যেন সজীব হয়ে উঠল। যে পাষাণ-শরীরে উত্তাপ ছিল না, সেখানে আবার উত্তাপ ফিরে এল ; যে-চোখে পলক পড়ছিল না, সে চোখে আবার পলক পড়তে লাগল ; যে-ওষ্ঠাধরে কোন কাঁপন ছিল না, সেই ওষ্ঠাধর আবার মৃদু-মৃদু কাঁপতে লাগল। দেখতে দেখতে এক অপরূপ লাবণ্যবতী রমণী করযোড়ে তাঁদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে রামচন্দ্রের চরণ-বন্দনা করলেন। অহল্যার উদ্ধার হল।

আবার তাঁরা চলতে লাগলেন বনের পথে। ক্রমে তাঁরা মিথিলায় জনক রাজার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্রের সংগে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখে জনক রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। পরম সমাদরে তাঁদের অতিথি-সৎকার করে যেন ধন্য হলেন। যজ্ঞ শেষ হবার পর বিশ্বামিত্র জনককে বললেন, "মহারাজ, রামচন্দ্র একবার আপনার হরধনু দেখতে চায়!" এই কথা শুনে রাজা জনক ভাবলেন, এ নিশ্চয় বিধাতার নির্দেশ। তা না হলে এ-সব কথা উঠে কেন? এই কিশোর বালক-ই বা হরধনু দেখতে চায় কেন? তবে কি সীতার উপযুক্ত বর এসে উপস্থিত হল! আর এমন উপযুক্ত পাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। মহারাজ দশরথের সংগে একটা সম্বন্ধ হওয়া বহু ভাগ্যের ফল। কিন্তু রামচন্দ্র দেখছি নিতান্ত কিশোর। যে-হরধনু তুলতে বড় বড়

মহাবীরেরা অক্ষম, রামচন্দ্র কি সে-কাজে সফল হবে! রাজা জনকের মনের কথা বুঝে বিশ্বামিত্র বললেন, "মহারাজ, রামের বল-বীর্যের কথা আমি ভাল রকম জানি। তাই আমি তাকে এখানে এনেছি। এই হরধনু আর কেউ তুলতে পারে নি বলে যে রামচন্দ্র পারবে না এমন কথা কি আছে। আপনি চিন্তিত হবেন না মহারাজ, আমার মনে হয় বিধাতার অভিপ্রায়েই রামচন্দ্র আজ এখানে এসেছে।"

বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হলে রাজা জনক ভাবলেন, ভগবানের কি অভিপ্রায় জানি না, হয়তো সীতার বিবাহের সময় উপস্থিত হয়েছে। এই ভেবে হরধনু যেখানে ছিল সেখানে তিনি রামচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন। প্রকাণ্ড ধনু সযত্নে বেদীর উপর রাখা হয়েছে ; যেমন মোটা তেমনি দৃঢ়। এ ধনু একটু নড়াতেই তো বড় বড় মহাবীর হিমসিম খেয়ে যায়। এটা তুলে ধরে তাতে জ্যা-লাগানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য, রামচন্দ্র সেই ধনুর কাছে গিয়ে তাকে দৃঢ়-হস্তে ধরে তুলে ফেললেন ; আর ধনুটি বেঁকিয়ে ধরে যেমন জ্যা লাগাতে যাবেন অমনি সেটা মড়-মড় শব্দে ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল। সে শব্দ শুনে সকলের হৃদ্‌কম্প হল, সকলে যেন স্তম্ভিত হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। সকলে ভাবল, এই কিশোর বালকের দেহে এতখানি শক্তি এল কোথা থেকে! ইনি কি সত্যই মানুষ, না নরদেহধারী কোন মহাদেবতা! রাজা জনক এবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তখনই চারদিকে শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। রামের মত জামাতা পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। আর কিছু মাত্র দেরী না করে তিনি তখনই মহারাজ দশরথের কাছে খবর পাঠালেন। একদিকে যেমন মিথিলায় মহোৎসব পড়ে গেল অন্যদিকে রাজা

দশরথ আনন্দে অধীর হয়ে লোকজন ও বিবাহের উপযোগী নানা জিনিসপত্র নিয়ে মিথিলায় এসে পড়লেন। একই শুভলগ্নে যাতে চার ছেলেরই এক সংগে বিয়ে হয় রাজা দশরথ সেই ব্যবস্থাই করলেন। রাজা জনকের দুই মেয়ে—সীতা ও উর্মিলা। সীতার সংগে বিয়ে হল রামের আর লক্ষ্মণের সংগে উর্মিলার। জনক রাজার ছোট ভাই কুশধ্বজেরও দুই মেয়ে—শ্রুতকীর্তি ও মাণ্ডবী। ভরতের সংগে শ্রুতকীর্তির ও শত্রুঘ্নের সংগে মাণ্ডবীর বিয়ে হল। এক সংগে চার ছেলের বিয়ে দিয়ে এমন উপযুক্ত চার পুত্রবধূ পাওয়াতে রাজা দশরথের মনে হল—তিনি এ পর্যন্ত যা-কিছু সাধনা, যা-কিছু কামনা করেছেন, তার ফল এবার অনেক বেশী পেলেন।



পরশুরামের আবির্ভাব

এবার রাজা দশরথ মহাসমারোহে পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে অযোধ্যার দিকে চললেন। কিন্তু পথে এক বিপদ উপস্থিত হল। জামদগ্নি ঋষির ছেলে পরশুরাম ছিলেন একজন মহাবীর। ক্ষত্রিয়দের উপর ভারী রাগ তাঁর। তিনি যখন শুনলেন সেই ভুবন-বিখ্যাত: হরধনু রামচন্দ্র সহজেই ভেঙে ফেলেছেন, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে ছুটে এসে রামচন্দ্রের সামনে দাঁড়ালেন। রাজা দশরথ পুত্রের এই বিপদে ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি তাড়াতাড়ি পাদ্য অর্ঘ সাজিয়ে পরশুরামকে দিতে গেলেন, কিন্তু পরশুরাম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে

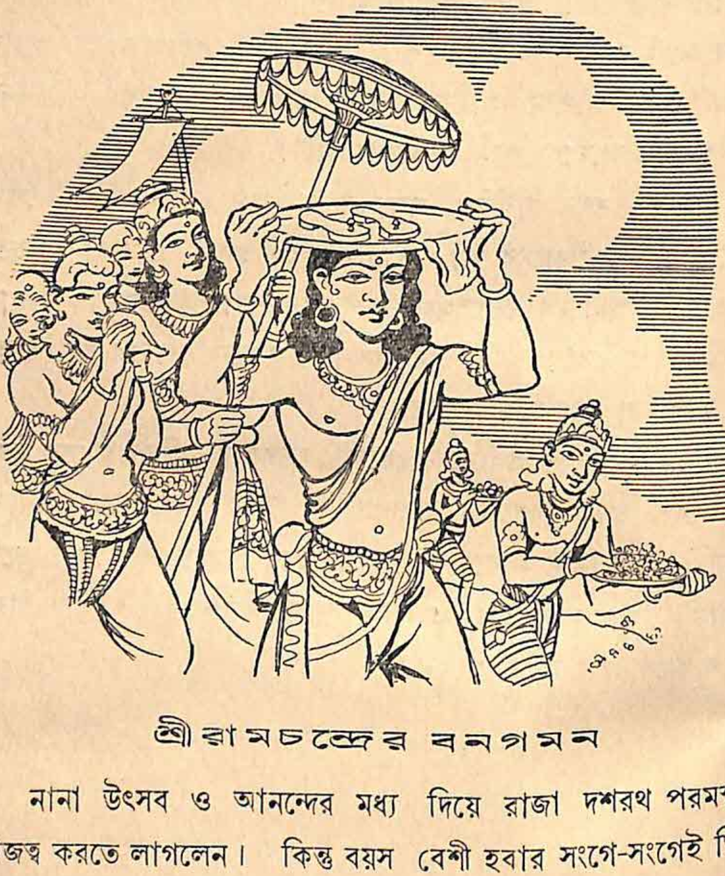
রামচন্দ্রকে বললেন ঃ "আমার পিতা জামদগ্নি নিহত হয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের হাতে। তাই ক্ষত্রিয়-জাতটার উপর আমার ঘৃণা ও রাগ সব চেয়ে বেশী। কোন ক্ষত্রিয়ই যুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে নি। কিন্তু যখন শুনলাম তোর মত একটা ক্ষত্রিয় হরধনু ভংগ করেছে ; তখন ভাবলাম, এমন বীর তো ক্ষত্রিয়দের মধ্যে রাখা উচিত নয়। তাই আমি ছুটে এসেছি তোকে স্বহস্তে নিধন করে নিশ্চিন্ত হতে। আর তাছাড়া, পূর্বে আমি ছিলাম একমাত্র রাম। এখন দেখছি তোরও নাম রাম। তোর মত একটা বালকের নামের সংগে আমার নামের যোগ থাকলে সেটা আমারই অপমান। আজ তোকে শেষ করবই করব। তবে এক কথা, আগে দেখি তোর শক্তি কতটুকু। আমারও এই ধনুক আছে। এতে জ্যা পরিয়ে তীর ছোড়্ দেখি।" এই বলে পরশুরাম তাঁর ধনুক রামচন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিলেন। রামচন্দ্র তখন মৃদু হেসে সহজেই সেই ধনুকে জ্যা-লাগিয়ে তীর ছুড়লেন। রামের শক্তি দেখে পরশুরাম তো অবাক। তাঁর আর দম্ভ করবার সাহস নেই। রামচন্দ্র তখন শান্তস্বরে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে বধ করে মহাপাতক হতে চাই না। আমার এই তীর কখনও বৃথা নষ্ট হতে পারে না। এখন বলুন আমার এই তীর দিয়ে আপনার গতিরোধ করব, না আপনার স্বর্গপথ বন্ধ করব ?"

পরশুরাম এই কথা শুনে বললেন, "হে রাম, আমার এখনও নানা তীর্থ-দর্শন করবার বহু সাধ। আপনি যদি আমার গতিরোধ করেন, তাহলে আমি নিশ্চলভাবে পড়ে থাকব। তখন আর আমার তীর্থ-দর্শনের আশা কী করে মিটবে। তবে আর একটা কথা— আমি স্বর্গসুখের অভিলাষী নই। স্বর্গসুখ নিয়েই বা আমার কি

হবে ? আমি শুনেছিলাম, আপনি নারায়ণের অবতার ; কিন্তু বিশ্বাস করি নি। আজ স্বচক্ষে আপনার অলৌকিক ভগবদ্-শক্তি দেখে আমি বুঝেছি আপনি কে। আমি জানি শরসন্ধান ব্যর্থ হবার নয়। এখন আপনি আমার স্বর্গপথ রোধ করতে পারেন। কেন-না স্বর্গের প্রতি আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।”

রামচন্দ্র তখন পূর্বদিক লক্ষ্য করে সেই ধনুকের তীর নিক্ষেপ করলেন। পরশুরামের স্বর্গ যাবার পথ বন্ধ হল। তারপর রামচন্দ্র নত হয়ে পরশুরামের চরণযুগল স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। হাজার হোক ব্রাহ্মণ তো ! পরশুরাম তখন শান্ত-মনে ‘তোমার জয় হোক’ এই আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

প্রথম থেকে পরশুরামকে দেখেই দশরথের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। এখন যখন দেখলেন রামচন্দ্র কি ভাবে পরশুরামের দর্পচূর্ণ করলেন তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে রামচন্দ্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মনে হল, এ যেন রামের পুনর্জন্ম। এইবার তাঁরা সকলে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।



শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন

নানা উৎসব ও আনন্দের মধ্য দিয়ে রাজা দশরথ পরমসুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। কিন্তু বয়স বেশী হবার সংগে-সংগেই তিনি যেন কেমন অথর্ব হয়ে পড়লেন। বার্ধক্য এসে তাঁকে গ্রাস করল। তিনি স্থির করলেন এবার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করাই উচিত। এই ভেবে তিনি রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলেন। রাজ্যে আনন্দের কলরব উঠল, ধূমধামের সাড়া পড়ে গেল, উৎসবের

আনন্দে প্রজারা আত্মহারা হয়ে উঠল ; রাজঅন্তঃপুরেও রাজার তিন রাণী কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা রামের অভিষেকের কথা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। হঠাৎ এক অনর্থ উপস্থিত হল। মন্থরা নামে কৈকেয়ীর এক দাসী কৈকেয়ীকে বোঝালেন তাঁর সতীন-পুত্র রাম রাজা হলে তাঁর আনন্দিত হবার কি আছে ? তাঁর নিজের ছেলে ভরত তো রাজা হয় নি। কৈকেয়ী মন্থরার কথা শুনে ভাবলেন, 'সত্যিই তো। আমার এতে লাভ কি?' তখন তিনি রাজা দশরথকে কাছে ডাকিয়ে বললেন, "মহারাজ, আপনার নিশ্চয় মনে আছে আপনি একদিন আমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। তখন আমি সে-বর নিই নি। এখন আমি সেই দুটি বর আপনার কাছে চাইছি। আপনি দেবেন তো ?"

রাজা হেসে বললেন, "তোমাকে না-দেবার আর কী আছে কৈকেয়ি। এই শুভ মহোৎসবের দিনে তোমার সে-দুটি বর অপূর্ণ রাখব না। এখন বল, তুমি কি-কি বর চাও ?"

কৈকেয়ী তখন দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "মহারাজ, আমার প্রথম প্রার্থনা রামের চোদ্দ বছর বনবাস, আর দ্বিতীয় প্রার্থনা রামের পরিবর্তে ভরতই হবে অযোধ্যার রাজা।"

দশরথ প্রথমে ভেবেছিলেন, কৈকেয়ী বোধ হয় রসিকতা করছেন কিন্তু কৈকেয়ীর দৃঢ় মনোভাব দেখে তিনি বুঝলেন এবার বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। একবার যখন বর দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তখন বর দিতেই হবে। কিন্তু এ-কী সর্বনেশে বর-প্রার্থনা ! রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞা পালন করলেন বটে কিন্তু উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে অভিষেকের সকল আয়োজন বন্ধ করে দিলেন। এই অসম্ভব কথা শুনে প্রজারা তো স্তম্ভিত। রাজ্যজুড়ে হাহাকার পড়ে গেল।

রামের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তাঁর মনে তখন কোন বিকার উপস্থিত হল না। পিতৃসত্য পালনে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখনই সীতাকে সংগে নিয়ে তিনি দণ্ডকারণ্য যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁর অনুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণ কিন্তু ছুটে এসে বললেন, "আমাকেও সাথী করে নিন।" রাম অনেক বোঝালেন, কিন্তু লক্ষ্মণ শুনলেন না। তিনিও রামের সাথী হলেন। মহামূল্য বেশভূষা ত্যাগ করে বনবাসীর মতই তাঁরা পরলেন বল্কল। তাঁদের এই বেশভূষা দেখে অযোধ্যাবাসী তো কেঁদেই আকুল। কোথায় রাজসিংহাসন আর কোথায় বনবাস! রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি দেখে সকলে বুঝলেন—এ আদর্শ গ্রহণ করা তো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। চারদিকে রামের জয় ঘোষণা হতে লাগল।

রাম, লক্ষণ ও সীতা বনবাসে যাবার পরেই বারবার রামের নাম উচ্চারণ করে পুত্রের শোকে দশরথ তখনই প্রাণত্যাগ করলেন। অন্ধমুনির অভিশাপ এইবার পূর্ণ হল।

কৈকেয়ীর ছেলে ভরত তাঁর মামার বাড়ীতে ছিলেন। রামের যে রাজ্যাভিষেক হবে এই কথা শুনে তিনিও আনন্দিত মনে অযোধ্যায় আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হঠাৎ এই দুঃসংবাদ তাঁর কানে গেল। তিনি প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর ছুটে অযোধ্যায় এসে সব কথা শুনে তিনি হাহাকার করে উঠলেন। তাঁর মা কৈকেয়ীর এ কী চক্রান্ত! এমনই কি করতে হয়? মাকে অনেক কথা বলেও তাঁর মন শান্ত হল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন অযোধ্যার সিংহাসনে তিনি কোনদিন বসবেন না। দশরথের সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি শেষ করে তিনি গেলেন দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্রকে খুঁজতে। ভীষণ বন। অনেক সন্ধান করে তিনি খুঁজে পেলেন

অগ্রজ রামচন্দ্রকে। ভরত এবার রামচন্দ্রের চরণযুগল জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন, ফিরে যাবার জন্যে অনেক মিনতি করলেন, অনেক বোঝালেন কিন্তু রামচন্দ্র অচল অটল। তিনি ভরতকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভাই ভরত, পিতা জীবিত থাকতে যে প্রতিজ্ঞা করে এই বনবাসে এসেছি আজ পিতা এই পৃথিবীতে আর নেই শুনে সে প্রতিজ্ঞা কেন ভংগ করব? এ তো কখনই হতে পারে না। আমার প্রতি তোমার ভক্তি ও তোমার মহত্ত্ব দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। আমি তো এখন আর অযোধ্যায় ফিরে যেতে পারি না।"

যখন কিছুতেই রামের মন টলল না তখন ভরত বললেন, আমারও প্রতিজ্ঞার কথা তবে শুনুন। রাজ্য আমি নোব না, সিংহাসনেও কোনদিন বসব না। আমি আপনার নামেই রাজ্য চালাব। সিংহাসনের উপর আপনার পায়ের পাদুকাযুগল রেখে আমি আপনার নামেই রাজ্যশাসন করব। আপনি যতদিন অযোধ্যায় না ফেরেন আমিও ততদিন আর অযোধ্যায় ফিরব না। এই বলে ভরত রামের পাদুকাযুগল নিয়ে নন্দীগ্রামে উপস্থিত হলেন। সিংহাসনে সেই পাদুকাযুগল রেখে সেখান থেকেই রামের নামে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

দণ্ডকারণ্য ছেড়ে রামচন্দ্র আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন। বনের মধ্যে তখনও অনেক রাক্ষসের বাস ছিল। তাদের মধ্যে একটা রাক্ষস একদিন হঠাৎ এসে সীতাদেবীকে ধরতে গেল। রাম-লক্ষ্মণ তো ব্যাপার দেখে অবাক। এতবড় দুঃসাহস এই রাক্ষসটার! তাঁরা তখনই রাক্ষসটাকে মেরে ফেলে একেবারে মাটির মধ্যে পুঁতে ফেললেন। বনের পথে চলতে-চলতে তাঁরা এবার এসে পৌঁছলেন পঞ্চবটীতে। কি চমৎকার শোভা পঞ্চবটীর! প্রকৃতি দেবী যেন

নিজের হাতে পরিপাটী করে এই বন সাজিয়ে রেখেছেন। চারিদিকে কী মনোরম শোভা! চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। কত রকমের পাখি, কত রকমের ফুল-ফল, কত রকমের তরুলতা, কত হরিণ-হরিণী, ময়ূর-ময়ূরী, আর তাছাড়া কত মুনিঋষিও বাস করেন এই বনে। তাঁরা তখন ঠিক করলেন এই বনেই কিছুকাল বাস করা যাক। লতায় পাতায় একখানি ঘর বেঁধে সেই ঘরে তাঁরা বাস করতে লাগলেন। রাম-সীতা থাকলেন ঘরের মধ্যে আর লক্ষ্মণ পাছে কোন রাক্ষস এসে আক্রমণ করে সেইজন্যে ধনুর্বাণ নিয়ে বাইরে পাহারা দিতে লাগলেন।



সূর্পনখার নাসিকা ছেদন

একদিন সূর্পনখা নামে এক মায়াবিনী রাক্ষসী এসে রামচন্দ্রের সুন্দর চেহারা দেখে বললে, "তুমি আমাকে বিয়ে কর না কেন। যদি আমাকে বিয়ে কর আমরা তুজনে পরম সুখে এই বনে বাস করব।"

রাম বললেন, "আমার কি আর বিয়ে বাকী আছে, অনেক দিনই তা হয়ে গেছে। এই দেখ না আমার স্ত্রী পাশেই রয়েছেন। আমার কাছে কিছু স্থবিধে হবে না বুঝতেই তো পারছ, তার চেয়ে

বরং আমার ভাইয়ের কাছে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পার।" এই বলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দেখিয়ে দিলেন। রাক্ষসী তখন লক্ষ্মণের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "দেখ, বিয়ে করার আমার বড় সাধ। তোমার দাদার কাছে তার সংগে বিয়ের কথা পাড়তেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন তোমার কাছে। এখন তুমিই না-হয় আমায় বিয়ে করে ফেল।"

লক্ষ্মণ তখন বললেন, "আরে সে-কী হয়। দাদার কাছে আগেই বিয়ের কথা বলে এসেছ, এখন আমি তোমায় বিয়ে করি কি করে? তার চেয়ে তুমি দাদার কাছে আর একবার যাও। চেষ্টা করে দেখ কোনরকমে তাঁকে রাজী করাতে পার কি-না।"

সূর্পনখা একথা শুনে আবার রামের কাছেই দৌড়ে এল। তাঁকে ধরে বসল বিয়ে করতেই হবে। সূর্পনখার কাণ্ড দেখে সীতাদেবী তো হেসেই খুন। এবার মায়াবিনী রাক্ষসী সূর্পনখা বুঝতে পারল কী-অপমানটাই না তার হয়েছে। তার উপর আবার একটা বৌ তাকে দেখে খিল-খিল করে হেসে উঠল। এ অপমান কি সহ্য করা যায়? তখন সূর্পনখা মায়াবিনীর মূর্তি ছেড়ে একটা ভীষণ বীভৎস রাক্ষসীর মূর্তি ধরে প্রকাণ্ড হাঁ-করে সীতাকে গিলে ফেলতে ছুটে এলো। সীতা তো ভয়েই অস্থির। কিন্তু লক্ষ্মণ তখনই ছুটে এসে তরবারি দিয়ে সূর্পনখার নাক-কাণ কেটে দিলেন। কাটা নাক-কান থেকে ঝর-ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল আর দারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে রাক্ষসী ছটফট করতে লাগল। তারপর 'ওগো দাদা গো, আমি যে মরে গেলাম গো' এই কথা বলে খোঁনা সুরে চেঁচাতে-চেঁচাতে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।

এদিকে তার নাক-কান কাটা দেখে ও করুণ বিলাপ শুনে

রাক্ষসের দল তো রেগেই অস্থির। তাদের সর্দার খর, দূষণ ও ত্রিশিরা স্ূর্পনখার অপমানের প্রতিফল দেবার জন্যে বিকট শব্দ করে পঞ্চবটীর কুটীর আক্রমণ করল। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা এতটা যে হবে আগে থেকে ভাবতেই পারেন নি। তখন রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে কুটীরের মধ্যে রেখে ধনুর্বাণ নিয়ে রাক্ষসদের সম্মুখীন হলেন। রাক্ষসরাও হুঙ্কার দিতে-দিতে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করল। তখন রামচন্দ্র এক-এক বাণে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা প্রভৃতি রাক্ষসদের বধ করে ফেললেন। অন্যান্য রাক্ষস যখন দেখল যে তাদের সর্দারেরা রামের বাণে মরে গেল তখন তারা আর যুদ্ধ না-করে প্রাণভয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। কাটা নাক-কান নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সূর্পনখা দূর থেকে এ যুদ্ধ দেখছিল। সে ভেবেছিল, রাম এবার খুব জব্দ হবে। তাঁদেরও নাক-কান কেটে নিয়ে তবে খর দূষণ শান্ত হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্যরূপ ফল হল। রাক্ষসেরা অনেকেই মরে গেল, অনেকেই বনের মধ্যে পালিয়ে গেল ; তখন আর সূর্পনখা দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে। সে তখন ছুটতে-ছুটতে নদনদী সাগর পেরিয়ে, নানা বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে অতিকষ্টে লংকায় গিয়ে উপস্থিত হল। লংকার রাজা রাবণ ছিল তার ভাই। রাবণ সূর্পনখার কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে রেগেই অস্থির। কী এত বড় আস্পর্ধা ! রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী সূর্পনখার অপমান। নাক-কান কেটে চিরজন্মের মত তাকে সকলের চোখে হীন করে রাখা। আর রামেরই-বা কি স্পর্ধা, কি এমন যুদ্ধ করবার তাঁর ক্ষমতা ; কেউ তো তাঁকে বড় যোদ্ধা বলে মানেও না। তাঁর ভাইটিও ঠিক তেমনি। কিন্তু শুনেছি রামের স্ত্রী পরমাসুন্দরী। অমন সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে সে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় কেন ? এইবার রাবণের মাথায় এক ভয়ানক খারাপ ফন্দি এল। আচ্ছা, রামের

সুন্দরী স্ত্রীটাকে ধরে আনলে কেমন হয় ? তাহলে রামকে কিন্তু খুব জব্দ করা হবে। আর রাম তো রাবণের সংগে যুদ্ধে পেরে উঠবে না। এই কথা ভেবে রাবণ সীতাহরণ করবার জন্যে তৈরী হল। কিন্তু আগে রামটাকে ও লক্ষ্মণটাকে সীতার কাছ থেকে সরানো দরকার। একটু ভাবতেই রাবণের মুখে হাসি ফুটে উঠল। একটা চমৎকার ফন্দি এবার তার মাথায় এসেছে। সে তখুনি মারীচ রাক্ষসকে ডেকে তাকে মায়াবলে সোনার হরিণের রূপ ধরতে বলল। মারীচ তখন সোনার হরিণের রূপ ধরে রাম-লক্ষ্মণের কুটীরের সামনে নেচে-নেচে বেড়াতে লাগল। কী সুন্দর সোনার হরিণ ! গায়ে সূর্যের আলো পড়ে যেন ঝকঝক করছে ওর গায়ের রঙ। কেমন নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে। অমন সুন্দর হরিণটিকে পাবার জন্যে সীতার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। রাম সীতার মনের ভাব বুঝে তখনই সেই সোনার হরিণের কাছে গেলেন তাকে ধরতে। রাম যত যান হরিণও তত বনের মধ্যে চলে যায়। ক্রমে ক্রমে রাম হরিণের পিছনে পিছনে অনেকখানি বনের মধ্যে চলে গেলেন। তাঁকে আর কুটীর থেকে দেখা গেল না।

এখন কুটীরে শুধু সীতা আর লক্ষ্মণ। একটু পরেই বনের ভেতর থেকে রামের কণ্ঠ শোনা গেল 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' সীতা রামের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলেন। তিনি তখনি লক্ষ্মণকে রামের কাছে গিয়ে সাহায্য করতে বললেন। লক্ষ্মণ প্রথমে রাম যে বিপদে পড়তে পারেন এ-কথা ভাবতেই পারলেন না, কিন্তু বনের মধ্যে থেকে বারবার রামের কাতর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলেন এ নিশ্চয় রাক্ষসের মায়া। সীতা কিন্তু লক্ষ্মণের উপর খুব চটে গিয়ে তাঁকে নানাভাবে তিরস্কার করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তখন অগত্যা ধনুর্বাণ নিয়ে গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হলেন।

লংকার রাজা রাবণ এই সুযোগই খুঁজছিল। সে তখনই তপস্বীর ছদ্মবেশে সীতার কুটীরের সামনে এসে কৌশলে সীতাকে হরণ করে নিয়ে কালবিলম্ব না করে একেবারে লংকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সেই অরণ্যে জটায়ু নামে রাজা দশরথের এক পক্ষীবন্ধু ছিলেন। তিনি সীতার এই অবস্থা দেখে ও ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে তেড়ে এলেন রাবণকে বাধা দিতে। কিন্তু রাবণের সংগে যুদ্ধে জটায়ু পেরে উঠবেন কি করে। তাঁকে প্রাণ হারাতে হল। তখন রাবণ সীতাকে নিয়ে একেবারে লংকায় গিয়ে উপস্থিত হল।

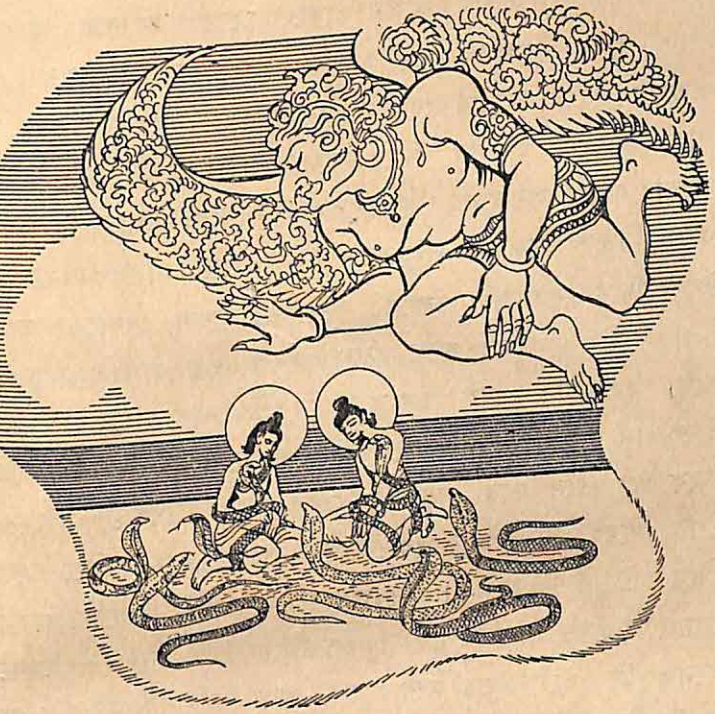
সোনার হরিণের পিছু-পিছু গিয়ে গভীর বনে রাম যখন শুনলেন ঠিক তাঁরই কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে সোনার হরিণটা চেঁচিয়ে বলছে "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!" তখনই রামের সন্দেহ হল যে এ রাক্ষসের মায়া। তিনি তখন হরিণকে ছেড়ে কি জানি কি অমংগল ঘটে এই ভেবে কুটীরের দিকে ছুটে আসছিলেন। হঠাৎ বনের মধ্যেই লক্ষ্মণের সংগে তাঁর দেখা। তখন ব্যাপার বুঝে রাম-লক্ষ্মণ দুভাই ছুটতে-ছুটতে কুটীরে এসে দেখেন—সীতা নাই। 'সীতা, সীতা' বলে ডাকতে-ডাকতে তাঁরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। কিন্তু কোথায় সীতা? তাঁর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। শেষে অনেকটা দূরে তাঁরা দেখলেন এক প্রকাণ্ড পাখী মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। রাম-লক্ষ্মণ তাঁর কাছে আসতেই তিনি জানালেন যে তিনি জটায়ু—রাজা দশরথের বন্ধু। লংকার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে আর তিনি তাকে প্রাণপণে বাধা দিয়েও কিছু করতে পারেন নি। রাবণের অস্ত্রাঘাতেই এবার তাঁর প্রাণ গেল। রাম-লক্ষ্মণকে একথা জানিয়েই জটায়ু প্রাণত্যাগ করলেন। যেন রাম-লক্ষ্মণকে এই কথাটি বলবার জন্যেই তিনি এতক্ষণ বেঁচে ছিলেন। জটায়ুকে পিতার

বন্ধু মনে করে রাম-লক্ষ্মণ তাঁর যথাবিধি সৎকার করলেন। তারপর দুই ভাই মিলে দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে লাগলেন। এই দক্ষিণাপথ ধরেই লংকাদ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রদ্বীপে পৌঁছানো যায়।

পথে যেতে-যেতে কোথা থেকে এক কবন্ধ রাক্ষসের সামনে তাঁরা পড়লেন। এই কবন্ধ রাক্ষস ভারি দুরন্ত ও ভয়ংকর। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ সরে না গিয়ে তাকে মারবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। যেই রাম তাঁকে এক বাণ মেরেছেন ওমনি দেখা গেল কবন্ধ আর নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে এক সুন্দরদেহ পুরুষ। তখন সেই পুরুষ রামচন্দ্রকে বলতে লাগলেন, কোন মুনির শাপে তিনি কবন্ধ-দেহ পেয়েছেন। এখন রামচন্দ্রের শরের স্পর্শে তাঁর মুক্তিলাভ ঘটল। তখন তিনি রামচন্দ্রের কাছে সীতাহরণের সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, রামচন্দ্র যেন সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব করেন। সুগ্রীবের বড় ভাই বালি। সে একাই সমস্ত রাজ্য অধিকার করে রাজা হয়ে বসেছে, আর সুগ্রীব রাজ্যের কোন অংশ না পেয়ে বনে-বনে দারুণ দুঃখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বালি ভাই হলেও সুগ্রীবের দিকে ফিরেও চায় না, তাকে দেখতেও পারে না। সে তখন আর কি করবে, কেই বা তাকে সাহায্য করবে—তা ভেবেই ঠিক করতে পারে নি। এখন রামচন্দ্র তার বন্ধু হলেন। রামচন্দ্র যদি বালিকে বধ করে বানররাজ্য সুগ্রীবকে ফিরিয়ে দেন তবে বড়ই ভাল হয়, তবেই বন্ধুর উপযুক্ত কাজ হয়। তখন রামচন্দ্র কৌশলেই বালিকে বধ করে বানররাজ্য সুগ্রীবকে দান করলেন এবং ভাবলেন, সুগ্রীব রাজ্যের বানরেরা নিশ্চয় তাঁকে সীতা-উদ্ধারে সাহায্য করবে। হলও তাই। হনুমান নামে এক বানর-সর্দার নানা স্থানে খোঁজ করে শেষে জটায়ুর দাদা সম্পাতির কাছ থেকে জানতে পারলেন রাবণ রাজার

রাজ্য কোথায়। কিন্তু লংকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সাগর। এ সাগর পারই বা হবেন কি করে হনুমান! হনুমানভা বলেন, 'জয় রাম' বলে দি-ই তো এক লাফ। যেমনি ভাবা, অমনি লাফ দেওয়া। হনুমান গিয়ে পড়লেন একেবারে লংকার ভিতর। কিন্তু লংকা তো আর ছোট জায়গা নয়। রাবণ সীতাকে কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছে —এটা প্রথমে ঠিক করতে পারলেন না হনুমান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখলেন একটা প্রকাণ্ড অশোক গাছের বাগান। সেই বাগানের একটা প্রকাণ্ড অশোক গাছের তলায় এক পরম রূপবতী নারী বসে-বসে কাঁদছেন, আর তাঁর চারদিকে রাক্ষসীর দল বসে-বসে পাহারা দিচ্ছে। হনুমানের মনে হল—এই নারী রামচন্দ্রের পত্নী সীতা ছাড়া আর কেউ নন। তখন হনুমান কৌশলেই সীতার কাছে গিয়ে রামচন্দ্রের আংটি দেখিয়ে সীতার মনে বিশ্বাস জাগালেন। অনেকদিন পর রামের হাতের আংটি দেখে একদিকে সীতার যেমন আনন্দ হল, অন্যদিকে তিনি দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন। রামচন্দ্রের সব কথা তাঁর মনে পড়ায় তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না।—চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে ফেললেন। কিন্তু হনুমান যে সীতার কাছে এসেছেন এর প্রমাণ চাই তো। তাই সীতা হনুমানকে তাঁর অংগ থেকে একখানি অলংকার খুলে দিলেন। সেই অলংকারখানি নিয়ে হনুমান আবার ফিরে আসব-আসব করছেন এমন সময় লংকার রাক্ষসেরা হনুমানকে দেখতে পেয়ে দলে-দলে তেড়ে এল তার দিকে। সারা লংকা জুড়ে হৈ-হৈ পড়ে গেল। হনুমানকে ধরবার জন্যে সকলে মিলে খুব চেষ্টা করতে লাগল। রাবণের অক্ষয় নামে এক ছেলে যেই হনুমানকে ধরতে গেছে হনুমান অমনি প্রাণপণ শক্তিতে তাকে চেপে ধরে মেরে ফেললেন। এই দুঃসংবাদ রাবণের আর ইন্দ্রজিতের কাছে পৌঁছতেই ইন্দ্রজিৎ ছুটে এল হনুমানের

কাছে। তখন ইন্দ্রজিতের মত বীর ত্রিভুবনে কেউ ছিল না। কাজেই ইন্দ্রজিতের সংগে হনুমান পারবে কেন? তখন ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে ধরে রাবণের সভায় নিয়ে গেল। রাবণ তো তাকে দেখেই রেগে অস্থির। তখনই তিনি হুকুম দিলেন, "এ ব্যাটার ল্যাজ দাও পুড়িয়ে।" রাবণের আদেশ শুনে দলে দলে রাক্ষস এসে হনুমানকে চেপে ধরে তার ল্যাজে বেশ করে কাপড় জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে যাতে ল্যাজটা ভালরকম পুড়ে যায়। ল্যাজে দারুণ যন্ত্রণা হলেও হনুমানের মাথায় এক বুদ্ধি এল। সে তখন ল্যাজের আগুন নিয়েই লংকার ঘরে ঘরে লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়াতে লাগল যাতে সব ঘরেই আগুন ধরে যায়। হলও তাই। সারা লংকা দাউ-দাউ করে পুড়তে লাগল। রাক্ষসেরা মহা ভয় পেয়ে সেই আগুন নেভাবার জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগল। হনুমানকে জব্দ করতে গিয়ে শেষে রাক্ষসেরাই নিজেরা খুব জব্দ হল। হনুমান তখন সাগরের তীরে গিয়ে আবার এক লাফে সাগর পার হয়ে রামচন্দ্রের সামনে এসে যোড়-হাতে দাঁড়ালেন ও রামচন্দ্রকে সব কথা বলে তার হাতে সীতাদেবীর অলংকারটি দিলেন। সীতাদেবীর অলংকারটি দেখে রামচন্দ্রের চোখের জল আর থামে না। তিনি তখন ওইটি বুকে চেপে ধরে সীতাকে উদ্দেশ করে কত বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর হনুমানের সংগে রাম ও লক্ষ্মণ সাগরের তীরে এসে উপস্থিত হলেন।



বিভীষণের লংকা ত্যাগ

লংকায় তখন আর এক কাণ্ড চলছিল। রাবণের এক ভাই বিভীষণ ব্যাপার বুঝে রাবণকে অনেক অনুরোধ করলেন রামের কাছে সীতাকে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু রাবণ বিভীষণের কোন কথা না শুনে তাকে শত্রু ভেবে লংকা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বিভীষণ তখন মনের দুঃখে সমুদ্রপার হয়ে রামকে খুঁজতে এলেন। এই সমুদ্র তীরেই বিভীষণের সংগে রাম-লক্ষ্মণের দেখা হয়ে গেল।

প্রথমে রাম বিভীষণকে বিশ্বাস করতে চান নি কিন্তু পরে তার সকল কথা শুনে তিনি বুঝলেন রাবণের ঘরের পরম শত্রু বিভীষণকে হাতে রাখা দরকার। তাই তিনি বিভীষণকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন। এবার বিভীষণের সংগে পরামর্শ করে রামচন্দ্র তাঁর বানর সৈন্যদের লংকায় নিয়ে যাবার জন্যে একটি সেতু নির্মাণ করবার সংকল্প করলেন। সেই সেতুটি সাগরের এপার থেকে লংকা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ তো শক্ত জিনিস নয় যে তার উপর দিয়ে সেতু-বাঁধা চলবে। তাই বানরেরা যেখানে যত কাঠ ও পাথর ছিল সেইসব জলে ঠেলে ফেলে এক প্রকাণ্ড সেতু তৈরী করে ফেললেন। সেই চমৎকার সেতুটি দেখে মনে হল যেন শ্রীভগবান সমুদ্রের উপর শুয়ে থাকবেন বলে স্বয়ং শেষনাগ পাতাল থেকে উঠে এসে তার দেহখানি বিস্তৃত করে দিয়েছে। এই সেতুর উপর দিয়েই রাম ও লক্ষ্মণ তাঁদের বানর সৈন্যদল নিয়ে লংকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাক্ষসেরা এ খবর পেয়ে রাবণকে জানাতেই সেও তার বিপুল সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধে নামল। রাবণের অনেকগুলি ছেলে যুদ্ধে মরে গেল, শেষে তার সবচেয়ে বীর ছেলে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে এসে নাগপাশ অস্ত্র দিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে বেঁধে ফেললে। তাঁদের আর নড়বার-চড়বার শক্তি রইল না। স্বয়ং বিষ্ণুর বাহন গরুড় এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে উড়ে এলেন রণস্থলে। তারপর নাগপাশের সাপগুলোকে ঠোঁট দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে রাম-লক্ষ্মণকে মুক্ত করে দিলেন। রাবণের কাছে এ সংবাদ পৌছতে তিনিও একটু আশ্চর্য হলেন বটে কিন্তু আবার ইন্দ্রজিৎকে পাঠাল রাম-লক্ষ্মণের সাথে যুদ্ধ করতে। ইন্দ্রজিৎ তো সহজ বীর নয়! সে এবার যুদ্ধে এসে লক্ষ্মণের বুকে মারল দারুণ শক্তিশেল অস্ত্র

এই শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন ; কিছুতেই তাঁর আর জ্ঞান ফেরে না। রাম কাতর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। ভাবলেন, ভাই লক্ষ্মণকে এবার বুঝি আর বাঁচানো গেল না। লক্ষ্মণের অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে লাগল। একমাত্র গন্ধমাদন পর্বতের সঞ্জীবনী লতার রস না-হলে লক্ষ্মণকে আর কোন ক্রমেই বাঁচানো যাবে না। তাই হনুমানকে পাঠানো হল গন্ধমাদন পর্বতের সঞ্জীবনী ঔষধ আনতে। হনুমান তখন সঞ্জীবনী লতা চিনতে না পেরে গন্ধমাদন পর্বতশুদ্ধ নিয়ে এসে হাজির। এবার সঞ্জীবনী লতার রস প্রয়োগ করতে লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরে এল। তিনি আবার বেঁচে উঠলেন।

দু-দুবার এইভাবে মরণের হাত থেকে ফিরে লক্ষ্মণের জেদ বেড়ে গেল ইন্দ্রজিৎকে মারবার। বিভীষণের সহায়তায় কৌশলে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিধন করলেন। এই সংবাদ পেয়ে লংকার ঘরে-ঘরে ঘোর হাহাকার জেগে উঠল। রাবণ শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। এখন ভরসা তাঁর ভাই কুম্ভকর্ণ। সকলে পরামর্শ করে তখন অসময়ে কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল। দেবতার বরে পুরো-ঘুম ঘুমিয়ে উঠলে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে হারানো ত্রিভুবনে কারো সাধ্য নয়। কিন্তু অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে কুম্ভকর্ণ খুবই রেগে গেলেন। যুদ্ধে যাবার পর বানররাজ সুগ্রীব তার নাক কান কেটে দিলেন। কুম্ভকর্ণ খুব যুদ্ধ করলেন বটে কিন্তু রামের হাতেই মারা গেলেন। এবার লংকায় আরও হাহাকার বেড়ে উঠল।

তখন লংকায় আর বড় যোদ্ধা কেউ ছিল না, অগত্যা রাবণকেই যুদ্ধে নামতে হল। একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি,—এ যুদ্ধে হয় রাম না-হয় রাবণ—একজনই বেঁচে থাকবে। রাবণ তখন

বিপুল সৈন্যসামন্ত নিয়ে রথে চড়ে রণক্ষেত্রে এলেন। রামের কিন্তু রথ নেই। স্বর্গ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র রামের সেই অবস্থা দেখে নিজের রথখানি পাঠিয়ে দিলেন রামচন্দ্রের জন্যে। রথের সঙ্গে এল ইন্দ্রের নিজের সারথি মাতলি, তার সঙ্গে ইন্দ্র পাঠিয়ে দিলেন নিজের বর্ম। সেই বর্ম পরে ইন্দ্রের রথে চড়ে রাম এগিয়ে গেলেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কিন্তু আশ্চর্য, যে-রাবণ রামের পরম শত্রু, যে-রাবণ তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন, যে-রাবণের জন্য তাঁর দুর্গতি ও লাঞ্ছনার শেষ নেই সেই-রাবণকে দেখে রামচন্দ্র একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ভাবলেন, ইনিই কি সেই রাবণ যিনি একদিন স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে পরাস্ত করে দেবতাদের উপর প্রভুত্ব করেছিলেন, ইনিই কি সেই রাবণ যিনি ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে নিজের মাথা নিজের হাতে উপহার দিতে গিয়েছিলেন, ইনিই কি সেই-রাবণ যিনি একদিন বাহুবলে কৈলাস পর্বতকেও ধরে তুলে ফেলেছিলেন! তাই রাবণকে সামনে দেখে রামচন্দ্র তাঁকে সম্মান দেখাতে ভুললেন না।

এইবার আরম্ভ হল রাম-রাবণের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ তো যে-সে যুদ্ধ নয়! ত্রিভুবন স্তম্ভিত হয়ে এ-যুদ্ধ দেখছে। সমস্ত জগৎ স্তব্ধভাবে রণক্ষেত্রের দিকে চেয়ে আছে। আকাশে দেবতারা অলক্ষ্যে থেকে এ ভীষণ যুদ্ধ দেখছেন। দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর সকলেরই মনে দারুণ আশঙ্কা—এ যুদ্ধের পরিণাম কি হবে। বাণে-বাণে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে। রাবণ যত বাণ মারেন রামচন্দ্র সে সমস্ত নিবারণ করেন। আবার রামচন্দ্র যত বাণ মারেন রাবণ সেগুলি ব্যর্থ করেন। জয়-পরাজয় কিছুই স্থির নয়। যুদ্ধে দুজনায় কেউ কম নন। রাবণ তখন খুব রেগে গিয়ে এক প্রকাণ্ড

গদার মত অস্ত্র রামচন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এই গদার গায়ে শত-শত লোহার কাঁটা। নাম তার শতঘ্নী। রামচন্দ্র দেখলেন মহাবিপদ। অস্ত্র তখন ভীষণবেগে তাঁর দিকে তেড়ে আসছে। তিনি তখন তাড়াতাড়ি অর্ধচন্দ্র বাণ মেরে সেই ভীষণ শতঘ্নী অস্ত্রকে পাকা কলার মত কুচ্ করে কেটে ফেললেন, অস্ত্রটি টুকরো-টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এবার আর দেরী নয়। রামচন্দ্র তাঁর ধনুকে জুড়লেন ব্রহ্মাস্ত্র। এ অস্ত্রের মত শক্তিশালী অস্ত্র ত্রিভুবনে আর কোথাও নেই। ব্রহ্মাস্ত্র ভীষণ বেগে আকাশে উঠে রাবণের দিকে ছুটে চলল। তারপর ভীষণ বেগে ভয়ঙ্কর শব্দে রাবণের মাথার কাছে ফেটে গেল। আর তার ভিতর থেকে শত-শত সাপের মত অগ্নিশিখা বেরিয়ে দশাননের দিকে ছুটে গেল। ব্রহ্মাস্ত্র যখন রাবণের মাথার উপর পড়ল তখন রাবণের দশমুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মুণ্ডহারা রাবণ থর-থর করে কাঁপতে-কাঁপতে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখনই স্বর্গ থেকে রামচন্দ্রের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। স্বর্গের দেবতারা আনন্দ-কোলাহল করতে লাগলেন।

সীতাদেবীকে উদ্ধার করে রামচন্দ্র যখন তাঁকে কাছে নিয়ে এলেন তখন সকলে বললেন, এতকাল সীতাদেবী দুর্বৃত্ত রাবণের ঘরে বন্দিনী ছিলেন। তাঁর মত সতী ত্রিভুবনে নেই এটা সকলেই জানে তবুও তাঁকে সকলের সামনে একবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হল। চারদিকে আগুন দাউ-দাউ জ্বলছে। তার মধ্যে সীতা দাঁড়িয়ে কিন্তু নিষ্পাপ সতীর অঙ্গ অগ্নি স্পর্শ করতে পারছে না। সকলেই সীতার নামে ধন্য-ধন্য করে উঠলেন।

এবার রামচন্দ্র বিভীষণকে লংকার সিংহাসনে বসিয়ে রাক্ষসরাজের

'পুষ্পকরথ' নামে ব্যোমযানে চড়ে লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করলেন। আকাশের শোভা দেখে ও আকাশ থেকে পৃথিবীর শোভা দেখে সকলের মন আনন্দে ভরে উঠল।

আগেকার দিনের পুষ্পক রথ কি-রকম ছিল তা ঠিক মত জানা না-গেলেও এই রথ যে আকাশ-পথে অনেকদূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারত, এমন কি সমুদ্রও পার হত তার বিষয় আমরা জানতে পারি। যে পুষ্পকরথে রাম লক্ষণ ও সীতা আকাশে উড়ে যাচ্ছিলেন সেই পুষ্পকরথ থেকে নীচের পৃথিবী কেমন দেখায় সব দিক দিয়ে তার সুন্দর বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা এমনই নিখুঁত ও স্বাভাবিক যে আকাশপথের যাত্রীদের পক্ষেই সেই সব দৃশ্য সে ভাবে দেখাই সম্ভব।

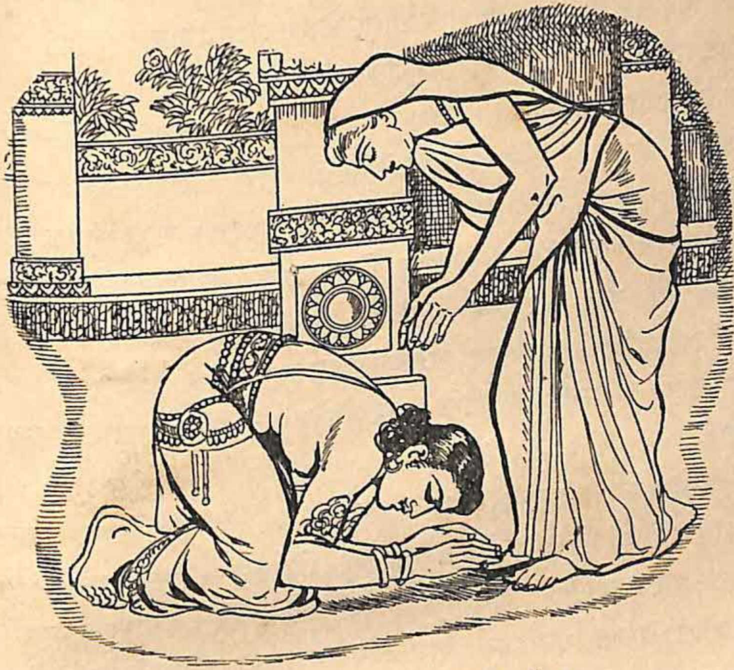
পুষ্পকরথ আকাশে উড়ে যাচ্ছে। তার চারপাশে মেঘরাশির কী অপূর্ব লীলা! সীতা তো সেই সব আশ্চর্য দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছেন। অনেকদিন সীতার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল রামের। তাই এখন সীতাকে কাছে পেয়ে রাম সীতার সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে লাগলেন। নীচের দিকে চেয়ে তাঁরা দেখলেন মহাসাগর ফেনিল তরঙ্গ তুলে গর্জন করছে। তার উপর রামের সুদীর্ঘ সেতুটি শোভা পাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যেন রাত্রিকালে মেঘহীন শরতের আকাশে দীর্ঘ ছায়াপথ রয়েছে। রাম বললেন, "এই যে সমুদ্র এত প্রকাণ্ড দেখছ, এ আগে এত বড় ছিল না। আমাদেরই পূর্বপুরুষ মহারাজ সগরের ছেলেরা যজ্ঞের ঘোড়া পৃথিবীর উপরে কোথাও খুঁজে না-পেয়ে ভেবেছিলেন নিশ্চয় সেই ঘোড়াকে কেউ পাতালে নিয়ে গেছে। তাই তাঁরা সকলে মিলে

পাতালে যাবার জন্যে চারদিকে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। সেই গর্ত বড় হতে-হতে জলে ভরে গিয়ে এখন মহাসাগরে দাঁড়িয়েছে।” সাগরের মধ্যে বড়-বড় তিমি মাছ মুখে জল টেনে নিচ্ছে আর সেই জল কপালের গর্ত দিয়ে ফোয়ারার মত বের করে জলকণায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন মহাসমুদ্রের বুকে একটি ফোয়ারা ছুটে চলেছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে জলের ভিতর থেকে জলহস্তীরা উঠে ঢেউএর সঙ্গে খেলা করছে। সমুদ্রে বড়-বড় সাপ থাকে। সেই সব সাপ যেমন লম্বা তেমনি মোটা। কখনও কখনও তারা সমুদ্রের ঢেউএর উপর দিয়ে ভাসতে-ভাসতে ছুটে চলে। অসংখ্য প্রবাল ছড়িয়ে আছে সমুদ্রের বুকে। এইসব দেখতে দেখতে পুষ্পকরথ এগিয়ে চলল। হঠাৎ দূর থেকে রামচন্দ্র সমুদ্রের কূল দেখতে পেলেন। সেই তীরের মাটিতে তাল ও তমাল গাছের বন। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন নীলবর্ণ তটভূমি লোহার চাকার মত পড়ে আছে। আর সমুদ্রের ঢেউএর দাগ তার উপরে কলঙ্কচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। কী সুন্দর সেই দৃশ্য! পুষ্পকরথের ভিতরে বসে তাঁরা মুগ্ধ চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে রইলেন। পুষ্পক রথ খুব বেগে আকাশে যতই উড়ে যাচ্ছে ততই তাঁদের মনে হচ্ছে সমুদ্রের ভিতর থেকে পৃথিবী যেন মাথা তুলে উঠছে। পুষ্পকরথের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে-বাড়িয়ে সীতা দেবী দুপাশের উড়ন্ত মেঘ মুঠি করে ধরছিলেন। হাত জলে ভিজে যাচ্ছিল আর মেঘগুলোর ভিতর থেকে বিদ্যুৎ যেন সীতার হাতে আলোর-কাঁকন পরিয়ে দিচ্ছিল। পুষ্পকরথ আরো উড়ে যাচ্ছে। এবার সাগর পেরিয়ে মাটির সঙ্গে পরিচয় লাভ করলেন তাঁরা। এই পথেই রামচন্দ্র সীতাকে হারিয়ে তাঁকে খুঁজতে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

সীতা কোথায় গেল - সে কথা রাম-লক্ষ্মণ দুভাই প্রথমে জানতে পারেন নি বটে, কিন্তু সীতার পায়ের খসে-পড়া নূপুর দেখে তাঁরা বুঝেছিলেন সীতা সেই পথেই কোথাও গেছেন। সীতার বিরহে আকুল হয়ে রামচন্দ্র বুঝেছিলেন সীতা মরে নি, বেঁচেই আছে। এই নূপুর-পাওয়া জায়গাটি সীতাকে পুষ্পকরথের ভিতর থেকে বারবার দেখাতে লাগলেন রামচন্দ্র। সীতাও বুঝলেন, তাঁর স্বামী রামচন্দ্র কী কষ্টই না পেয়েছেন তাঁকে খুঁজে বের করতে। সীতার দুচোখ জলে ভরে এল। তিনি আবেগ ভরে রামচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এইবার দেখতে পেলেন তাঁরা গোদাবরী নদী। সেই নদী দেখে কত স্মৃতিই তাঁদের মনে পড়ল। এই গোদাবরীর তীরে পঞ্চবটী বনে একদিন কত আনন্দেই না তাঁদের দিন কেটেছে। সেই সব মধুর স্বপ্ন কী সহজে ভোলা যায়! যে-যে পথে সীতা ভ্রমণ করতেন; যে-যে গাছে তিনি জল দিয়ে তাদের জীবনদান করতেন সেই গাছগুলিও তাঁদের চোখে পড়ল। এখন সে গাছগুলি কত বড় হয়েছে। তাদের দিকে চেয়ে সীতার চোখে জল এল। পঞ্চবটীতে যে কুটীর তৈয়ারী করে তাঁরা সেখানে বাস করতেন সেই বেতের কুটীরও দেখতে পেলেন তাঁরা। এখন সেটা শূন্য পড়ে আছে। তার চারপাশে বন্যলতাগাছ বড় হয়ে সেটাকে প্রায় ঢেকে ফেলবার মত করেছে। রামচন্দ্রের মনে পড়ল, এই কুটীরেই একদিন সীতার কোলে মাথা রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। হরিণ-গুলি ছুটোছুটি করছে—তাদের দেখে সীতা চিনতে পারলেন। এরাই সেইসব হরিণশাবক—যাদের সীতা একদিন নিজের হাতে খাইয়েছেন, সীতার হাতে না-খেলে তারা আর কারও হাত থেকে ঘাস খেত না। কত দৃশ্য মধুময় স্মৃতিমাখা। সেইসব দেখতে-

দেখতে তাঁরা আকাশপথে আরও এগিয়ে চললেন। পঞ্চবটী পার হয়ে তাঁদের চোখে পড়ল তপোবন। যেখানে মুনিঋষিরা কঠোর তপস্যা করতেন ভগবানকে পাবার জন্যে। তাঁরা দেখতে পেলেন অগস্ত্য মুনির আশ্রম। যে অগস্ত্যমুনির সামান্য ভ্রূকুটিতে ইন্দ্রের সিংহাসন থেকে নহুষের পতন হয়েছিল। এইবার এল শাতকর্ণির বাসস্থান। শাতকর্ণি একদিন কঠোর তপস্যাবলে স্বর্গ অধিকার করতে চেয়েছিলেন। ইন্দ্র দেখলেন মহাবিপদ! স্বর্গরাজ্য বুঝি যায়! তিনি অমনি সুন্দরী অপ্সরাদের পাঠালেন মুনির তপোভঙ্গ করতে। ইন্দ্রের ছলনা ঠিকমত বুঝতে না-পেরে অপ্সরাদের রূপ দেখে মুনি তপস্যায় দিলেন জলাঞ্জলি। তখন আশ্রমের সে তপস্যার মত পরিবেশ আর রইল না। হাস্যকৌতুক, নাচগান ও বিলাসলীলা নষ্ট করে দিলে আশ্রমের পবিত্রতা। শাতকর্ণি কঠোর তপস্যার পরে হঠাৎ মজে গেলেন অপ্সরাদের নিয়ে। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ পুষ্পকরথের ভিতর থেকেই শুনতে পেলেন—তখনও চমৎকার নাচগান হচ্ছে সেখানে বাজনার তালে তালে। শাতকর্ণির তপোবন এখন আমোদভবনে পরিণত হয়েছে। এইবার রথ আরও এগিয়ে চলল। অনেকগুলি তপোবন পার হয়ে তাঁরা প্রয়াগের উপর এসে পড়লেন। এ সেই প্রয়াগ যেখানে গঙ্গা ও যমুনানদী এক সঙ্গে মিশেছে। এমন মহাতীর্থ জগতে আর কোথায়! এখনকার দিনে প্রয়াগ যেমন মহাতীর্থ, রামচন্দ্রের যুগেও ঠিক তেমনিই ছিল। প্রয়াগের দৃশ্য দেখে তাঁদের মনে কত পবিত্র ভাবের উদয় হল। এইবার তাঁরা প্রয়াগ ছেড়ে যেতেই তাঁদের চোখে পড়ল সরযূ নদী। সরযূ নদীকে দেখে তাঁদের চোখে জল এল। এই সরযূ নদী অযোধ্যা নগরের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে। কত স্মৃতি জড়ানো আছে এরই তটে, কত

অতীতের গীতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে এরই তরঙ্গ কল্লোলে। তাঁরা ভাবলেন, এইবার অযোধ্যা এসেছে; আমাদের নামতে হবে। রামচন্দ্রের মনে হল এই অযোধ্যা কি আগেকার সেই অযোধ্যা আছে? যার বুকে কেটেছে তাঁর বাল্য-কৈশোর, যে অযোধ্যার প্রতিটি স্থান তাঁর একান্ত পরিচিত, যার বাতাস এখনও ভরে আছে অতীতের কত কথায়, কত গানে! দীর্ঘ দিন পরে সেই অযোধ্যায় এবার ফিরে এলেন তাঁরা। তাঁরা আসছেন এই সংবাদ হনুমান নিশ্চয় ভরতকে দিয়েছিল। তাই অযোধ্যার পুরবাসীরা, সৈন্যসামন্ত, আত্মীয়স্বজন সব ছুটে এসেছিল নগরের বাহিরের প্রান্তরের দিকে। সেখানে সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে ছিল আকাশপানে। আকাশে রথ দেখা যেতেই চারদিকে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। তারপর রথ আকাশ থেকে ঘুরে ঘুরে ধীরে-ধীরে মাটিতে নামল। অযোধ্যাবাসীরা আগে এ রকম আকাশযান কখনও দেখে নি। প্রান্তরের উপর পুষ্পকরথ যেই এসে থেমেছে অমনি সকলে ছুটে এসে রথ ঘিরে দাঁড়াল, আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে রথের দিকে চেয়ে রইল।



অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন

সকলের সঙ্গে কুলগুরু বশিষ্ঠও এসেছিলেন রামচন্দ্রের আগমনের সংবাদ পেয়ে। রামচন্দ্র প্রথমেই মহর্ষি বশিষ্ঠের পদধূলি নিলেন তারপর আকুল আগ্রহে পরম স্নেহে ভরত ও শত্রুঘ্নকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

ভরত ও শত্রুঘ্ন এবার সীতাদেবীর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে অভিবাদন করলেন। সীতাও কুশল প্রশ্ন করে তাঁদের প্রতি স্নেহ দেখাতে ভুললেন না। রামের মনে হল তিনি যেন পুনর্জন্মলাভ করলেন। এত স্নেহ, এত মমতা, এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধা, এত আশীর্বাদ

তিনি যেন আর কোথাও পান নি ! কিন্তু অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে যেতে তাঁর মন সরলো না। সেখানে গিয়ে কি দেখবেন তিনি ? পূর্বস্মৃতির সহস্রদংশনে কাতর হয়ে লাভ কি ? তাই তিনি ভরতকে তাঁর সে অভিপ্রায় জানালেন। ভরত বললেন, রামচন্দ্রের এ অভিপ্রায় তিনি আগেই অনুমান করেছিলেন। তাই রাজপ্রাসাদ থেকে কিছুদূরে সরযূ নদীর তীরে এক উপবন রামচন্দ্রের জন্যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন তিনি। শত্রুঘ্ন নিজের হাতে সে উপবন নানাভাবে মনের মত করে তুলেছেন। তাঁরা জেনেছিলেন রামচন্দ্র এখানেই থাকবেন, উপবনে আরও অনেক চমৎকার পটভবন তৈরী হয়েছিল। রামচন্দ্রের সহচর অনুচরদের সেই পটভবনে থাকবার ব্যবস্থা করা হল।

উপবনের মধ্যে রামচন্দ্রের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন মাতা কৌশল্যা ও মাতা সুমিত্রা। রামের বিচ্ছেদে চোদ্দ বছর ধরে কেঁদে-কেঁদে তাঁদের চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁদের দুজনকে প্রণাম করে অশ্রুভরা চোখে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন। প্রাণপণ শক্তিতে চোখ মেলে কৌশল্যা ও সুমিত্রা ভাল করে তাঁদের মুখ দেখতে চাইলেন। কিন্তু চোখের দৃষ্টি অন্ধ-প্রায় বলে তাঁদের মনের আশা পূর্ণ হল না। তখন তাঁরা গায়ে হাত বুলিয়ে স্পর্শ অনুভব করলেন। কত আনন্দ তাঁদের। যত রকম আশীর্বাদ সম্ভব সবই তাঁরা করলেন রামচন্দ্রকে। স্নেহভরে তাঁদের কাছে বসে বারবার কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

এবার স্থির হল রামচন্দ্রের যে অভিষেক চোদ্দ বছর আগে হতে-হতে হয় নি এবার সে অভিষেক সম্পূর্ণ করতে হবে। সমস্ত অযোধ্যাবাসী এ কথা শুনে আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। একদিনেই

অযোধ্যা যেন আনন্দে মুখরিত হল। প্রতি গৃহে সকলে নানা সজ্জা নানা আভরণ পরে অভিষেক দিনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। দ্বারে-দ্বারে মঙ্গল ঘট স্থাপিত হল, গীতবাদ্যের ব্যবস্থা হল, আর রামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল। অযোধ্যাবাসীরা বহুদিন থেকে এই শুভদিনটির কামনা করে আসছিল। আজ তাদের সে কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। রাজ্যের মধ্যে কোথাও যেন দুঃখ শোক যাতনা-বেদনা নেই, সব যেন উৎসবের আনন্দে ভরে উঠেছে। রামের অভিষেক সে-কী সহজ কথা! যে রাম চোদ্দ বছর বনে বাস করে কত কষ্টই না পেয়েছেন, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ যাঁর সঙ্গে সেই দুঃখকষ্টের সাথী হয়েছেন, আজ সেই রাম আবার ফিরে এসেছেন অযোধ্যায়। উৎসবের সংবাদ পেয়ে নানাদিক থেকে, নানা দেশ থেকে দলে-দলে কত লোক, কত রাজা, কত মুনিঋষি যে অযোধ্যায় আসতে লাগলেন তার আর সংখ্যা নেই।

এইবার শ্রীরামচন্দ্রের শুভ অভিষেকের দিন এল। নানা তীর্থের পুণ্যজলে স্নান করাই অভিষেকের নিয়ম। সেই জল রামচন্দ্রের মাথায় সিঞ্চন করা হল। কিন্তু শুধু সেই জল নয় তাঁর মায়েদের চোখের জলও তার সঙ্গে মিশানো ছিল। এই চোখের জল আনন্দের, দুঃখের নয়। চোদ্দ বছর আগে যে শুভদিন এসে আবার দুর্ভাগ্যক্রমে সরে গিয়েছিল সেই শুভদিন এবার ফিরে এসেছে। কত দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনের শেষ অংশ কাটিয়ে শ্রীরামচন্দ্র আবার সিংহাসনে বসবেন! অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসে রঘুবংশের কুলপ্রদীপ ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিক মহাবীর রামচন্দ্র অযোধ্যার শাসনদণ্ড নিজের হাতে নেবেন! এর চেয়ে সুখের বিষয় অযোধ্যাবাসীর আর কী থাকতে পারে?

বহু সৈন্যসামন্ত অনুচরবর্গ মুনিঋষি ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে দীর্ঘ শোভাযাত্রা চলল অযোধ্যার দিকে। রাম রথের উপর সিংহাসনে বসে ছিলেন। ভরত তাঁর মাথার উপর রাজছত্র ধরেছিলেন। লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন তাঁর দুপাশে দাঁড়িয়ে চামর-ব্যজন করছিলেন। সে এক অপূর্ব শোভা! বহুদিন পরে রামচন্দ্রকে সে বেশে দেখে অযোধ্যা-বাসীরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল। রামের রথের পিছনে-পিছনে একটি ছোট রথে সীতাদেবীও চলছিলেন। চারদিকে জয় জয় ধ্বনি, সকলের মুখে আনন্দ-কলরব।

শোভাযাত্রা ধীরে-ধীরে চলছিল। গীতবাদ্য স্তবস্তুতি প্রভৃতি মিলে এক অপূর্ব ধ্বনিমূর্ছনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এবার শোভাযাত্রা থামল অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের দ্বারে। রথ থেকে নেমে বহুদিন পরে রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। চোখে তাঁর জল, বেদনায় হৃদয় কম্পিত। তিনি ধীরে-ধীরে প্রাসাদে অঙ্গন-প্রাঙ্গণ অলিন্দ সোপানশ্রেণী পার হয়ে প্রবেশ করলেন তাঁর পিতা রাজা দশরথের রাজকক্ষে। একবার মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখ দুটি যেন খুঁজছিল রাজা দশরথকে। সেই শূন্য কক্ষের মধ্যে কত অতীতের স্মৃতি এখনও ছড়ানো রয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের মনে হল রাজা দশরথ যেন তখনও সেই কক্ষে রয়েছেন। কিন্তু হায়! শূন্যকক্ষের চারিদিকে সহস্র-স্মৃতি বলে দিলে মহারাজ দশরথ আর নেই। এইবার ধীরে-ধীরে তিনি সেই কক্ষের দেওয়ালের কাছে উপস্থিত হলেন। সেখানে রাজা দশরথের এক প্রকাণ্ড চিত্র শোভা পাচ্ছিল। সেই চিত্রকে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করে রামচন্দ্র এবার কক্ষের বাইরে এলেন। তারপর পাশের কৈকেয়ীর কক্ষে প্রবেশ করলেন। কৈকেয়ীকে সম্মুখে দেখে তিনি ভক্তিভরে তাঁকে

প্রণাম করে তাঁর পদধূলি মাথায় নিলেন। কৈকেয়ী প্রথমে ভেবেছিলেন তাঁরই জন্য যেকালে রামের বনবাস হয়েছিল, জীবনে বহুকষ্ট রাম পেয়েছিলেন, এখন না জানি রাজা হয়ে রাম তাঁর সঙ্গে কী ব্যবহারই করবেন! কিন্তু রাম অশ্রুসিক্ত চোখে যখন কৈকেয়ীর পদতলে পড়ে পরম ভক্তিচিত্তে তাঁকে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন তখনই কৈকেয়ীর সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গেল! তিনি রামচন্দ্রের মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রাণভরে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। কৈকেয়ীর চোখে তখন এইভাব ছিল—রামচন্দ্র তুমি পুত্র হলেও আমার অপরাধের জন্য তুমি আমায় মার্জনা কর বৎস। আমার সকল অপরাধ মন থেকে দূর কর। আমি জানি, আমিই তোমার এ দুর্ভাগ্যের কারণ; কিন্তু তুমি যদি মার্জনা না কর তাহলে আমি এ-পাপ থেকে কোনদিন মুক্তি পাব না।

রামচন্দ্র যে বানরের দল নিয়ে অযোধ্যায় এসেছিলেন তারা চিরদিন বনেজঙ্গলে বাস করে এসেছে; নগর বা জনপদ কখন দেখে নি। বনের মধ্যে গাছে-গাছে ঘুরে বেড়াত তারা, বনের ফল খেয়ে জীবনধারণ করত। কিন্তু এখন মানুষের শহরে এসে তারা যে কী করবে ভেবেই ঠিক করতে পারলে না। ছুটোছুটি লাফালাফি আনন্দে ডিগবাজি খাওয়া তো আছেই, তাছাড়া তারা লাফ দিয়ে-দিয়ে বাড়ির ছাতে উঠতে লাগল, রাস্তার যানবাহনে চড়তে লাগল, ছেলে-মেয়েদের ভয় দেখাতে লাগল, আর জিনিসপত্র খাবারদাবার ছড়িয়ে খেয়ে তছনছ করতে লাগল। তাদের রকমসকম ও ব্যবহার দেখে

অযোধ্যাবাসীরা বেশ মজা উপভোগ করতে লাগল। তাদের জন্য রাজভোগ এল, বড় বড় হাঁড়িতে করে। কিন্তু সে রাজভোগ তারা না খেয়ে চারপাশে গাছের উপরে উঠে ফল পেড়ে খেতে লাগল। কখন কখন গাছের ডাল পাতা ভেঙে পথে ছড়িয়ে দিতে লাগল। অযোধ্যাবাসীদের ঘরে যেসব গৃহস্থালী জিনিসপত্র ছিল সেগুলির ব্যবহার তো তারা জানত না, তাই সেইসব নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এমন মজার কাণ্ড তারা করে বসল যে লোকে তো হেসেই অস্থির। এইভাবে অযোধ্যাবাসীদের নানাভাবে আমোদ দিয়ে শেষে তাদের বিদায়ের দিন এল। সীতাদেবী ভাবলেন, আহা, এরাই আমাকে উদ্ধার করেছে ; এদের একদিন পেট ভরে খাওয়ানো চাই। তাই তিনি নিজে নানারকম জিনিস দিয়ে তাদের খাইয়ে তাদের সঙ্গে নানা উপহারও দিলেন। সেইসব উপহার যে কী তা তারা জানত না। তবুও স্বয়ং সীতাদেবী দিচ্ছেন বলে তারা সেসব হাত পেতে নিল। এবার তাদের বিদায়ের পালা। হাজার রকম দুষ্টুমি করলেও এইসব বানরের দলকে অযোধ্যাবাসীরা স্নেহের চোখে দেখেছিল। তাই তাদের বিদায়ের দিনে সকলের চোখে জল এল। তারাও কেন জানি না, বোধ হয় মনের ভাব বুঝতে পেরে কেমন যেন বিমর্ষভাবে অযোধ্যা ছেড়ে চলে গেল।

রাম রাজা হলেন বটে, কিন্তু রাজ্যসুখ ভোগ করার চেয়ে সুশাসনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল বেশী। প্রজাদের কোন অভাব-অভিযোগ দেখলে তিনি তার প্রতিকারে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। লোকের দুঃখকষ্ট শোকতাপ সব যেন অন্তর্হিত হল শ্রীরামচন্দ্রের মধুর ব্যবহারে। আদর্শ রাজারূপে তিনি সকলের শ্রদ্ধা পেলেন। এমন রাজা এর আগে কোনদিন কেউ দেখে নি। একদিকে যেমন তাঁর প্রতাপে শত্রুরা শঙ্কিত হয়ে উঠল, অন্যদিকে তাঁর সদয় ব্যবহারে কেউ আর তাঁর শত্রু হয়ে

থাকতে চাইল না। দিনের পর দিন রাজ্যের উন্নতি হতে লাগল। বহুদিনের দুঃখকষ্টের পর এবার সুখের মুখ দেখতে পেয়েছে সকলে।

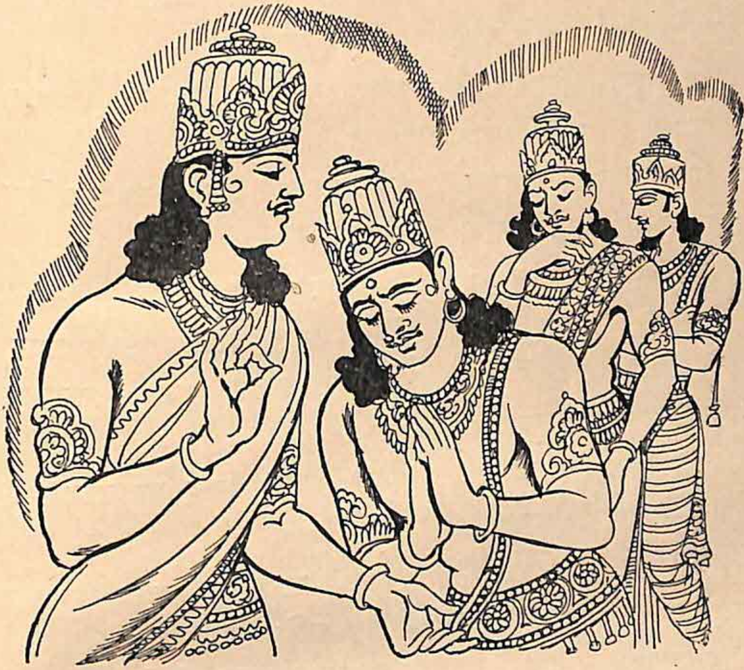
এইসময়ে জানা গেল সীতাদেবী গর্ভবতী। কিছুদিন পরেই তাঁর সন্তান হবে। রাজপুরীর সকলের মনেই আনন্দ, রাজ্যজুড়ে উৎসব চলল। এই সময়ে একদিন রামচন্দ্র সীতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বল তো, এই সময় তোমার কি ভাল লাগে ? তোমার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখবো না আমি।"

সীতা বললেন, "মহারাজ, আমার সব সাধই তো আপনি মিটিয়েছেন, আর কিছুই আমি চাই না। তবে ঋষিদের তপোবন দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। একদিন পঞ্চবটীতে কত তপোবন দেখেছি, সেসব স্মৃতি এখনও মনে জেগে আছে। মাঝে মাঝে সেই তপোবন দেখবার ইচ্ছা আমার মনে জেগে ওঠে। কিন্তু রাজপুরীতে তপোবন কোথায় পাব ? আপনার যদি অনুমতি হয় তবে কাছাকাছি কোন তপোবন দেখে আসি।"

রামচন্দ্র বললেন, "বেশ তো, তোমার এ সাধ অপূর্ণ রাখবো না আমি। তোমার কোন চিন্তা নেই, শীঘ্রই তোমাকে তপোবন দেখিয়ে আনবার ব্যবস্থা করছি।"

অযোধ্যা নগরীর শোভা দেখবার জন্যে রামচন্দ্র উঠলেন প্রাসাদের ছাদের উপর। যতদূর দেখা যায় তিনি দেখতে পেলেন ছোট বড় কত গৃহ, কত উদ্যান, কত সরোবর, কত মন্দির, কত বিদ্যাগৃহ। তিনি ভাবলেন এই সবের মধ্যে বাস করছেন তাঁর প্রজাগণ। তাদের মঙ্গলের জন্যই ভগবানের ইচ্ছায় তিনি আজ রাজসিংহাসনে বসেছেন। অযোধ্যার মাঝখান দিয়ে একটা প্রশস্ত রাজপথ চলে

গেছে। সেই রাজপথের দুইপাশে কত দোকানশ্রেণী। পথিকদের মধ্যে কেমন একটা চঞ্চলতা, সজীবতা। সামনে সরযূ নদী। সেই নদীর বুকে শত-শত তরণী, কত অর্ণবপোত। নগরের শোভার পর তার উপকণ্ঠের শোভা তাঁর নজরে পড়ল। সেখানে কত সুন্দর উদ্যান, উপবন। নরনারীর দল কতরকম সাজে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেইসব উদ্যানে। এইসব দেখে রামচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বারবার নিজ রাজ্যের শোভা দেখতে লাগলেন।



সীতাদেবীর লোকাপবাদ

তাঁর পাশে এক পার্শ্বচর ছিল, নাম তার ভদ্র। তার সংগেই রামচন্দ্র মাঝে মাঝে অযোধ্যার শোভা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এবার হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আচ্ছা ভদ্র, আমার সম্বন্ধে প্রজারা কি বলে সে বিষয়ে তুমি কি কিছু জান?"

ভদ্র বিনীতভাবে উত্তর দিল, "মহারাজ, অযোধ্যাবাসীর পরম ভাগ্য যে আপনার মত রাজা তারা পেয়েছে। চারিদিকে আপনার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও যশ। দেশে আপনার শত্রু বলে কেউ নেই। সকলেই আপনার প্রশংসাধ্বনি করে থাকে। কিন্তু মহারাজ—"

রামচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কথা বলতে-বলতে কিন্তু বলে থামলে কেন ভদ্র? কি বলতে চাও তুমি নির্ভয়ে বল।"

ভদ্র বলল, "মহারাজ, সে কথা কোনদিন আমার মুখ থেকে বের হবে না। আমি বলতে পারব না।"

রামচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বললেন, "তোমায় বলতেই হবে। যতই অপ্রিয় হোক সেকথা, আমার শোনা খুব দরকার।"

ভদ্র তবুও কথা বলে না, মাথা নত করে থাকে।

রামচন্দ্র বিস্মিত হলেন। তিনি এবার কঠোর স্বরে বললেন, "তুমি কি আমার আদেশ শুনতে পাচ্ছ না ভদ্র? তোমাকে বলতেই হবে সে কী-কথা।"

ভদ্র ধীরে-ধীরে বলল, "আপনার সম্বন্ধে কিছু নয়, তবে সেটা রাণীমা সীতাদেবীর সম্বন্ধে।"

"সীতাদেবীর সম্বন্ধে!" চমকিত হলেন রামচন্দ্র। তারপর বললেন, "বেশ, প্রজারা সীতাদেবী সম্বন্ধে কি বলে?"

ভদ্র বলল, "তারা—তারা বলে, রাণীমা সীতাদেবী ছিলেন বহুদিন দুর্ধর্ষ-প্রকৃতি রাবণের ঘরে। তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে রাণীপদে বসানো মহারাজের পক্ষে উচিত হয় নি।"

রামচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে ভদ্রের এই কথা শুনলেন। এ কী গুরুতর অপবাদ সীতার নামে! তিনি বললেন ভদ্রকে "প্রজারা কি সকলেই এই কথা বলে?"

ভদ্র বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।"

অস্থির হয়ে উঠলেন রামচন্দ্র। প্রাসাদের ছাদের উপর তিনি চঞ্চলপদে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর তখনকার সেই ভাব দেখে পার্শ্বচর ভদ্র শংকিত হয়ে উঠল। রামচন্দ্রের মনে তখন শুধু এই

কথাই বারবার জেগে উঠছে—সীতা যতই নিষ্পাপ হোক, প্রজাদের দেওয়া এ কলংক সূর্যবংশের রাজা হয়ে তিনি কি করে সহ্য করবেন ? সীতার চেয়েও তাঁর কাছে মনে হয় বংশের গরিমা ও মহিমা অনেক বেশী। তিনি আর কিছু না বলে দ্রুতপদে নেমে এলেন প্রাসাদের ছাদ থেকে। তারপর বিষণ্ণহৃদয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন রাজকার্যের মাঝখানে।

সারারাত তিনি ঘুমোতে পারলেন না। তাঁর দারুণ মনোবেদনার কথাও কাউকে জানালেন না ; সীতাকে তো নয়-ই। অবশেষে স্থির করলেন সীতাকে ত্যাগ করা ছাড়া এ কলংকমোচনের আর অন্য কোন পথ নাই। একদিকে কঠিন কর্তব্য আর একদিকে পত্নীপ্রেম—এই দুইয়ের সংঘাতে অস্থির হয়ে উঠলেন শ্রীরামচন্দ্র। যে বীরহৃদয় শত দুঃখেও টলে নি আজ সীতাকে ত্যাগ করবার দুঃখে সে হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হতে লাগল। শুধু জাগল তাঁর মনে একটি কথা—কর্তব্য। রাজার কর্তব্যের কাছে, বংশের সুনাম রক্ষার কর্তব্যের কাছে তার স্বকীয় স্বামীর কর্তব্য যেন কত তুচ্ছ !

সারারাত না-ঘুমিয়ে ছটফট করে সকালে উঠেই রামচন্দ্র ডাকালেন ভাইদের। তাঁদের সবকথা তিনি জানালেন : "অপবাদ তো ভাল কথা নয়। যাতে এই অপবাদ থেকে মুক্ত হতে পারা যায় সেই পথ অবলম্বন করাই ভাল। আমার সারা অন্তর বলছে সীতাদেবী নিষ্পাপ, তাঁর চরিত্রে কোন কলংক নেই, সীতার মত সতীসাধ্বী জগতে একান্ত দুর্লভ ; কিন্তু প্রজারা যদি সর্বদাই তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাঁর চরিত্রে অপবাদ দেয় তাহলে আমি সীতার প্রশংসা করলে কী হবে সে প্রশংসার মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন বিষের জ্বালা রয়েছে। আকাশের চাঁদ কী সুন্দর, কী মনোহর ! কিন্তু

রামচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কথা বলতে-বলতে কিন্তু বলে থামলে কেন ভদ্র? কি বলতে চাও তুমি নির্ভয়ে বল।"

ভদ্র বলল, "মহারাজ, সে কথা কোনদিন আমার মুখ থেকে বের হবে না। আমি বলতে পারব না।"

রামচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বললেন, "তোমায় বলতেই হবে। যতই অপ্রিয় হোক সেকথা, আমার শোনা খুব দরকার।"

ভদ্র তবুও কথা বলে না, মাথা নত করে থাকে।

রামচন্দ্র বিস্মিত হলেন। তিনি এবার কঠোর স্বরে বললেন, "তুমি কি আমার আদেশ শুনতে পাচ্ছ না ভদ্র? তোমাকে বলতেই হবে সে কী-কথা।"

ভদ্র ধীরে-ধীরে বলল, "আপনার সম্বন্ধে কিছু নয়, তবে সেটা রাণীমা সীতাদেবীর সম্বন্ধে।"

"সীতাদেবীর সম্বন্ধে!" চমকিত হলেন রামচন্দ্র। তারপর বললেন, "বেশ, প্রজারা সীতাদেবী সম্বন্ধে কি বলে?"

ভদ্র বলল, "তারা—তারা বলে, রাণীমা সীতাদেবী ছিলেন বহুদিন দুর্ধর্ষ-প্রকৃতি রাবণের ঘরে। তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে রাণীপদে বসানো মহারাজের পক্ষে উচিত হয় নি।"

রামচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে ভদ্রের এই কথা শুনলেন। এ কী গুরুতর অপবাদ সীতার নামে! তিনি বললেন ভদ্রকে "প্রজারা কি সকলেই এই কথা বলে?"

ভদ্র বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।"

অস্থির হয়ে উঠলেন রামচন্দ্র। প্রাসাদের ছাদের উপর তিনি চঞ্চলপদে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর তখনকার সেই ভাব দেখে পার্শ্বচর ভদ্র শংকিত হয়ে উঠল। রামচন্দ্রের মনে তখন শুধু এই

কথাই বারবার জেগে উঠছে—সীতা যতই নিষ্পাপ হোক, প্রজাদের দেওয়া এ কলংক সূর্যবংশের রাজা হয়ে তিনি কি করে সহ্য করবেন ? সীতার চেয়েও তাঁর কাছে মনে হয় বংশের গরিমা ও মহিমা অনেক বেশী। তিনি আর কিছু না বলে দ্রুতপদে নেমে এলেন প্রাসাদের ছাদ থেকে। তারপর বিষণ্ণহৃদয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন রাজকার্যের মাঝখানে।

সারারাত তিনি ঘুমোতে পারলেন না। তাঁর দারুণ মনোবেদনার কথাও কাউকে জানালেন না ; সীতাকে তো নয়-ই। অবশেষে স্থির করলেন সীতাকে ত্যাগ করা ছাড়া এ কলংকমোচনের আর অন্য কোন পথ নাই। একদিকে কঠিন কর্তব্য আর একদিকে পত্নীপ্রেম—এই দুইয়ের সংঘাতে অস্থির হয়ে উঠলেন শ্রীরামচন্দ্র। যে বীরহৃদয় শত দুঃখেও টলে নি আজ সীতাকে ত্যাগ করবার দুঃখে সে হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হতে লাগল। শুধু জাগল তাঁর মনে একটি কথা—কর্তব্য। রাজার কর্তব্যের কাছে, বংশের সুনাম রক্ষার কর্তব্যের কাছে তার স্বকীয় স্বামীর কর্তব্য যেন কত তুচ্ছ !

সারারাত না-ঘুমিয়ে ছটফট করে সকালে উঠেই রামচন্দ্র ডাকালেন ভাইদের। তাঁদের সবকথা তিনি জানালেন ঃ "অপবাদ তো ভাল কথা নয়। যাতে এই অপবাদ থেকে মুক্ত হতে পারা যায় সেই পথ অবলম্বন করাই ভাল। আমার সারা অন্তর বলছে সীতাদেবী নিষ্পাপ, তাঁর চরিত্রে কোন কলংক নেই, সীতার মত সতীসাধ্বী জগতে একান্ত দুর্লভ ; কিন্তু প্রজারা যদি সর্বদাই তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাঁর চরিত্রে অপবাদ দেয় তাহলে আমি সীতার প্রশংসা করলে কী হবে সে প্রশংসার মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন বিষের জ্বালা রয়েছে। আকাশের চাঁদ কী সুন্দর, কী মনোহর ! কিন্তু

রামচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কথা বলতে-বলতে কিন্তু বলে থামলে কেন ভদ্র? কি বলতে চাও তুমি নির্ভয়ে বল।"

ভদ্র বলল, "মহারাজ, সে কথা কোনদিন আমার মুখ থেকে বের হবে না। আমি বলতে পারব না।"

রামচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বললেন, "তোমায় বলতেই হবে। যতই অপ্রিয় হোক সেকথা, আমার শোনা খুব দরকার।"

ভদ্র তবুও কথা বলে না, মাথা নত করে থাকে।

রামচন্দ্র বিস্মিত হলেন। তিনি এবার কঠোর স্বরে বললেন, "তুমি কি আমার আদেশ শুনতে পাচ্ছ না ভদ্র? তোমাকে বলতেই হবে সে কী-কথা।"

ভদ্র ধীরে-ধীরে বলল, "আপনার সম্বন্ধে কিছু নয়, তবে সেটা রাণীমা সীতাদেবীর সম্বন্ধে।"

"সীতাদেবীর সম্বন্ধে!" চমকিত হলেন রামচন্দ্র। তারপর বললেন, "বেশ, প্রজারা সীতাদেবী সম্বন্ধে কি বলে?"

ভদ্র বলল, "তারা—তারা বলে, রাণীমা সীতাদেবী ছিলেন বহুদিন দুর্ধর্ষ-প্রকৃতি রাবণের ঘরে। তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে রাণীপদে বসানো মহারাজের পক্ষে উচিত হয় নি।"

রামচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে ভদ্রের এই কথা শুনলেন। এ কী গুরুতর অপবাদ সীতার নামে! তিনি বললেন ভদ্রকে "প্রজারা কি সকলেই এই কথা বলে?"

ভদ্র বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।"

অস্থির হয়ে উঠলেন রামচন্দ্র। প্রাসাদের ছাদের উপর তিনি চঞ্চলপদে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর তখনকার সেই ভাব দেখে পার্শ্বচর ভদ্র শংকিত হয়ে উঠল। রামচন্দ্রের মনে তখন শুধু এই

কথাই বারবার জেগে উঠছে—সীতা যতই নিষ্পাপ হোক, প্রজাদের দেওয়া এ কলংক সূর্যবংশের রাজা হয়ে তিনি কি করে সহ্য করবেন ? সীতার চেয়েও তাঁর কাছে মনে হয় বংশের গরিমা ও মহিমা অনেক বেশী। তিনি আর কিছু না বলে দ্রুতপদে নেমে এলেন প্রাসাদের ছাদ থেকে। তারপর বিষণ্ণহৃদয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন রাজকার্যের মাঝখানে।

সারারাত তিনি ঘুমোতে পারলেন না। তাঁর দারুণ মনোবেদনার কথাও কাউকে জানালেন না ; সীতাকে তো নয়-ই। অবশেষে স্থির করলেন সীতাকে ত্যাগ করা ছাড়া এ কলংকমোচনের আর অন্য কোন পথ নাই। একদিকে কঠিন কর্তব্য আর একদিকে পত্নীপ্রেম—এই দুইয়ের সংঘাতে অস্থির হয়ে উঠলেন শ্রীরামচন্দ্র। যে বীরহৃদয় শত দুঃখেও টলে নি আজ সীতাকে ত্যাগ করবার দুঃখে সে হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হতে লাগল। শুধু জাগল তাঁর মনে একটি কথা—কর্তব্য। রাজার কর্তব্যের কাছে, বংশের সুনাম রক্ষার কর্তব্যের কাছে তার স্বকীয় স্বামীর কর্তব্য যেন কত তুচ্ছ !

সারারাত না-ঘুমিয়ে ছটফট করে সকালে উঠেই রামচন্দ্র ডাকালেন ভাইদের। তাঁদের সবকথা তিনি জানালেন ঃ "অপবাদ তো ভাল কথা নয়। যাতে এই অপবাদ থেকে মুক্ত হতে পারা যায় সেই পথ অবলম্বন করাই ভাল। আমার সারা অন্তর বলছে সীতাদেবী নিষ্পাপ, তাঁর চরিত্রে কোন কলংক নেই, সীতার মত সতীসাধ্বী জগতে একান্ত দুর্লভ ; কিন্তু প্রজারা যদি সর্বদাই তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাঁর চরিত্রে অপবাদ দেয় তাহলে আমি সীতার প্রশংসা করলে কী হবে সে প্রশংসার মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন বিষের জ্বালা রয়েছে। আকাশের চাঁদ কী সুন্দর, কী মনোহর ! কিন্তু

পূর্ণচাঁদের উপর যখন পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে তখন চাঁদ হয় কলংকী, কিন্তু সত্যই তো সে কলংক চাঁদের নয়। লোকের বোঝবার ভুল, দেখবার ভুল। মিছামিছি চাঁদকে কলংকী করে লাভ কি? সীতার কথাও তেমনি। নিষ্পাপ হলেও সীতার উপর পড়েছে অপবাদের ছায়া। এই অপবাদ মাথায় রেখে সীতা কেমন করে রাজরাণী হয়ে থাকবে? আমি এ অপবাদ আর বাড়িয়ে তুলতে চাই না। আমার মহাকষ্ট হলেও পরম দুঃখিত মনে আমি সীতাকে ত্যাগ করব। তোমরা কেউ আমাকে বাধা দিও না, কেউ আমাকে অনুরোধ ক'র না। আমি রাজা, কর্তব্যজ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে।"

রামের কথা শুনে সকলেই চমকে উঠলেন। এ কী অসম্ভব কথা বলছেন শ্রীরামচন্দ্র! এ-ও কী সম্ভব! রামের কথার কোন উত্তর দিতে না পেরে তাঁরা সকলেই নতমুখে চুপ করে বসে রইলেন। রামচন্দ্র তখন সেস্থান ত্যাগ করে লক্ষ্মণকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ভাই লক্ষ্মণ, সবই তো শুনলে। এখন আমি যা বলি তাই কর। সীতা তপোবন দেখবার জন্যে খুব ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তুমি তপোবন দেখাবার ছল করে সীতাকে অযোধ্যা নগরের বাইরে নিয়ে যাও। কাছেই আছে বাল্মীকির আশ্রম। তুমি সেই আশ্রমে সীতাকে নিয়ে গিয়ে রেখে এস।"



সীতার বনবাস

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশ শুনে স্তম্ভিত হলেন। কোনদিন তিনি রামচন্দ্রের আদেশ লংঘন করেন নি আজও তাই করতে পারলেন না।

রথ প্রস্তুত হল। সীতাদেবী দেবর লক্ষ্মণের সংগে যাচ্ছেন তপোবন দেখতে। এই কথাই সর্বসমক্ষে প্রচার হল। সীতার আনন্দ আর ধরে না। কতদিন পরে বহুআকাংখিত তপোবন দেখতে পাবেন তিনি। রামচন্দ্র গম্ভীর মুখে অশ্রুভরা চোখে সীতাদেবীকে বিদায় দিলেন।

রথ ধীরে ধীরে অযোধ্যার রাজপথ অতিক্রম করে বাল্মীকির তপোবনের উদ্দেশে ধাবিত হল। সীতা আনন্দিত মনে লক্ষ্মণের সংগে নানা গল্প গুজব করছিলেন। হঠাৎ কেন জানি না তাঁর দক্ষিণ চোখ ঘন ঘন নেচে উঠল। নারীর পক্ষে এটা একটা মহা অমংগলের চিহ্ন। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কী জানি ভবিষ্যতে কি অমংগল হবে—এই কথা ভেবে সীতা নানা চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন।

এইবার রথ এসে পড়ল ভাগীরথীর তীরে। ভাগীরথীর ওপারে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। রথ থেকে নেমে ভাগীরথী পার হবার জন্যে তাঁরা উঠলেন নৌকাতে। নৌকা নদী পার হয়ে বাল্মীকির তপোবনের ঘাটে এসে পোঁছল। অতি যত্নের সংগে সীতাদেবীকে নৌকা থেকে নামিয়ে দিয়ে লক্ষ্মণ করযোড়ে তাঁকে জানালেন শ্রীরামচন্দ্রের নির্মম আদেশ। প্রথমে সীতাদেবী ভেবেছিলেন, এ বোধ হয় দেবরের কৌতুক। কিন্তু পরমূহূর্তে লক্ষ্মণের চোখে অশ্রু দেখে সীতাদেবী ভাবলেন এ কৌতুক নয়। তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। যে রামচন্দ্র তাঁর জীবনের জীবন, দুঃখ-কষ্টে হর্ষ-বেদনায়, বনে-জংগলে যে রামচন্দ্রের সংগিনী ছিলেন তিনি, কত অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছেন তিনি রামচন্দ্রের মুখখানি ভেবে, কোনদিন যিনি রামচন্দ্রের স্নেহ থেকে প্রেম থেকে বঞ্চিত হন নি, আজ সেই রামচন্দ্র তাঁকে কী করে ত্যাগ করতে পারলেন! এ যে চিন্তারও অতীত! সীতা এই কথা ভাবতে-ভাবতে তখনই মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন মাটিতে। অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে লক্ষ্মণ তাঁর মূর্ছা ভংগ করলেন। সীতা উঠে বসলেন বটে কিন্তু জগৎ সংসার তখন তাঁর কাছে অন্ধকার হয়ে গেছে। রামচন্দ্রের কাছ থেকে এমন নির্মম ব্যবহার পেলেও সীতাদেবী তাঁকে দোষ দিলেন না। ভাবলেন,

নিজের অদৃষ্টের দোষেই এই অঘটন ঘটল। না-জানি পূর্বজন্মে তিনি কি মহাপাপ করেছিলেন তাই স্বামীর প্রেম থেকে বঞ্চিতা হয়ে অমন স্বামীর মত স্বামীকে ত্যাগ করে তাঁকে বনবাসে আসতে হল। যে সংসারের কুললক্ষ্মী হয়ে ছিলেন তিনি, সে মধুর সংসার এখন তাঁর কাছ থেকে কত দূরে!

তিনি এবার লক্ষ্মণের দিকে চেয়ে বললেন, "আজ আমার গর্ভে রয়েছে তাঁর সন্তান। তা যদি না থাকত এখনই আমি আত্ম-ঘাতিনী হয়ে এ জীবন ত্যাগ করতাম। আমি এখনই মরে গেলে তাঁর বংশের সন্তানও সংগে সংগে বিনষ্ট হবে। তাঁর সন্তানের মুখ চেয়েই আমাকে সব জ্বালা সহ্য করতে হবে, আমাকে কোনরকমে বেঁচে থাকতে হবে। আগে যাঁরা বনে তপস্যা করতেন তাঁরা যেতেন রাজার কাছে, তাঁদের দুঃখ দূর করবার আকাংখা নিয়ে। আর এখন আমি রাজরাণী হয়েও সেই তপস্বীদের আশ্রমে এসেছি আমার দুঃখের জ্বালা লাঘব করতে!" লক্ষ্মণ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সীতার এই আক্ষেপ শুনতে লাগলেন, একটিও কথা বললেন না। তখন তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু পড়ছিল। সীতাদেবী এবার আকাশের দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভগবানের উদ্দেশে বললেন, "হে ভগবান, আমি যদি পরজন্মে আবার নারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করি তখন যেন রামচন্দ্রই হন আমার স্বামী। কোনদিন যেন তাঁর সংগে আমার বিচ্ছেদের জ্বালা সহ্য করতে না হয়।" তারপর আবার লক্ষ্মণের দিকে ফিরে সীতাদেবী বললেন, "তোমার এ কথা শোনবার পর আমি তো আর রাজরাণী নই। তবে তাঁর রাজ্যে আমাকে যে-কালে বাস করতেই হবে তখন আমি তাঁর প্রজামাত্র। প্রজার মতই যেন তিনি আমার সামান্য কুশল সংবাদটাও নেন। তাঁর স্ত্রী বলে

আমার আর উচ্চাকাংখা নেই। আমি একজন সামান্যা, দীনা, হীনা, নগণ্যা প্রজা। আবার কবে তাঁকে দেখতে পাব জানি না, তবে তাঁর চিন্তাতেই আমার দিবারাত্রি কাটবে।"

লক্ষ্মণ আর যেন এ সকল কথা শুনতে পারছিলেন না; তাঁর চোখ দিয়ে নির্ঝরের মত অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল, তাঁর সর্বাংগ যেন অবশ শিথিল হয়ে আসছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সীতাকে প্রণাম করে দ্রুত পদক্ষেপে দূরে চলে গেলেন। যতদূর দেখা যায় লক্ষ্মণকে প্রাণভরে দেখতে লাগলেন সীতা। তারপর যখন লক্ষ্মণ তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন তখন দুঃখে বেদনায় ভয়ে আশংকায় তিনি মাটিতে পড়ে হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হল যেন কোন বাণবিদ্ধা হরিণী মাটিতে পড়ে ছটফট করছে।

নির্জন বনের ধারে সীতার কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ বাতাস যেন ভরে উঠল। বনের তরুলতাও সীতার দুঃখে দুঃখিত, যেন স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে! কী করুণ সুর সে বুক ফাটা কান্নার! যে সব ময়ূর তপোবনে কলাপবিস্তার করে নেচে নেচে ফিরছিল, সীতার কান্নার সুরে তারা কলাপ গুটিয়ে, নাচ থামিয়ে সীতার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ঘাস খেতে গিয়ে হরিণেরা ঘাস না খেয়েই ছুটে এল সীতার কাছে, আর চেয়ে রইল করুণ চোখে সীতার মুখের পানে। বনের পশুরা দূর থেকে সীতার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। পাখিরা যেন কাকলি ভুলে গেল। চারদিকে যেন শোকের ছায়া, সমস্ত প্রকৃতি যেন বেদনায় কাতর! সীতার তবুও কান্না থামে না। অব্যক্ত যাতনায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তিনি কাঁদছেন; চোখের জলে তাঁর সর্বাংগ ভিজে গেছে, মাটিও ভিজেছে অনেকখানি।

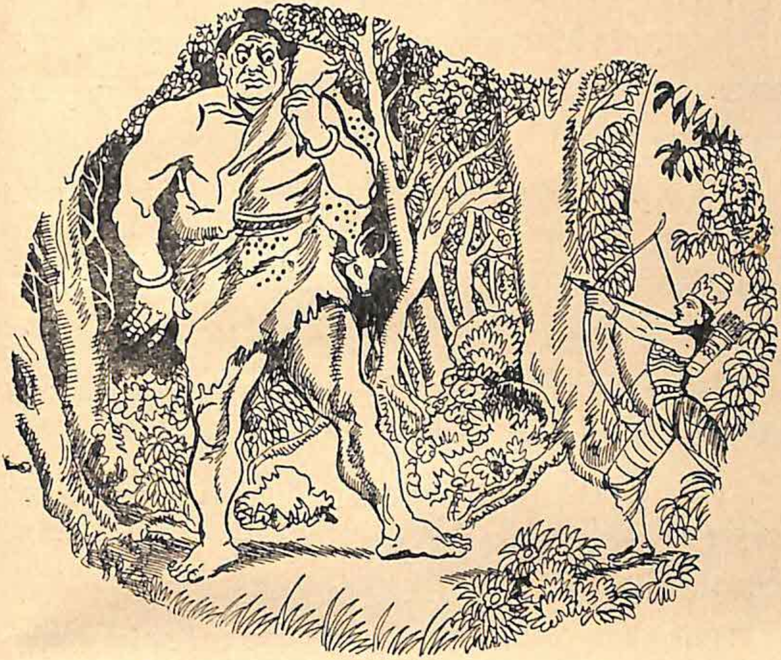
মহামুনি বাল্মীকি যাচ্ছিলেন যজ্ঞের জন্য কুশ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ

করতে। হঠাৎ তাঁর কানে এল সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি, সেই করুণ বিলাপ। তিনি চমকে উঠে এগিয়ে এলেন সীতার দিকে। এ কী দৃশ্য তাঁর সামনে! তপস্যাবলে তিনি চিনতে পারলেন সীতাদেবীকে। সীতা তখন সামনে জটাজুটধারী দীর্ঘশ্মশ্রু মুনিবরকে দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। বাল্মীকি শান্তস্বরে বললেন: আমি তোমায় চিনেছি মা। তুমি সুপুত্রের জননী হও। আমি যোগবলে সব কিছু জানতে পেরেছি। তোমার স্বামী রামচন্দ্র পরম জ্ঞানী হয়েও শুধু দুষ্টলোকের অপবাদের ভয়ে তোমার মত সুলক্ষণা কুললক্ষ্মীকে ত্যাগ করে খুবই অন্যায় করেছে। তোমার শ্বশুর স্বর্গীয় মহারাজ দশরথ ছিলেন আমার পরম সুহৃদ্। তোমার পিতা রাজর্ষি জনকও আমাকে যথেষ্ট সম্মান করে থাকেন। আমার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তিও কম নয়। কিন্তু মা, তুমি এসেছ আমার তপোবনে। এ আমারও পরম সৌভাগ্য। তোমার কোন ভয় নেই। তুমি আমার আশ্রমেই থাকবে। আমার আশ্রমে যে সব মুনিকন্যা আছে তারা হবে তোমার সংগিনী। সব সময়েই তারা থাকবে তোমার সংগে। যখন তোমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তখন সে সন্তানও লালিত পালিত হবে আমারই আশ্রমে। তুমি আমার কন্যাস্বরূপা, আমি তোমার পিতা। সুতরাং এই আশ্রম তোমারই বাপের বাড়ি এই কথা মনে করো।”

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্বাসবাক্য শুনে সীতাদেবীর মন কিছু শান্ত হল। তারপর বাল্মীকি তাঁকে নিয়ে আশ্রমে গেলেন। তাঁর আগমনবার্তা শুনে মুনিকন্যারা তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে ছুটে এল তাঁর কাছে। কী আনন্দই যে তাঁরা পেলেন সীতাকে দেখে তা বলবার নয়। সীতা এবার গেলেন মুনিকন্যাদের সাথে নদীতে স্নান করতে। তারপর ফিরে এসে বহুমূল্য শাড়ি ও অলংকার ছেড়ে

পরলেন মুনিকন্যাদের মতই বল্কল। মাত্র শুধু এয়োতীর চিহ্ন রাখলেন দেহে। যিনি নিত্য রাজভোগ খেতেন আজ তিনি খেলেন তাদের সংগেই ফলমূল। যিনি শয়ন করতেন সোনার পালংকের কোমল শয্যায় আজ তিনি শয়ন করলেন পর্ণকুটীরে মৃগচর্মের উপর।

লক্ষ্মণ ফিরে গেছেন অযোধ্যায়। রামচন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে কোন কথাই বলতে পারছেন না তিনি। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। রামচন্দ্র একদৃষ্টে নিমেষহারা হয়ে লক্ষ্মণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনিও নির্বাক। লোকনিন্দার ভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করলেও মন থেকে তিনি সীতাকে কী করে পরিত্যাগ করবেন! সদাসর্বদা সীতার কাতর মুখখানি তাঁর মনে জাগছে। এক মুহূর্তের জন্য সীতাকে ভুলতে পারছেন না তিনি। মনের মধ্যে একটা নিদারুণ হাহাকার যেন জেগে উঠছে। কোন কাজেই তিনি মন দিতে পারছেন না। রাণীহীন রাজা কখনও সিংহাসনে বসতে পারেন না, তাই অনেকেই পরামর্শ দিলেন: "মহারাজ, আপনি আবার বিবাহ করুন।" কিন্তু রাম কিছুতেই সম্মত হলেন না। রাজ্যের মংগলের জন্য যখন নানা যজ্ঞের আয়োজন হত তখন সে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্য দরকার হত তাঁর ধর্মপত্নীর। তাই সীতাকে না-পেয়ে তিনি সীতার স্বর্ণপ্রতিমা নির্মাণ করে তাঁর পাশে রেখে যজ্ঞের পুণ্য কাজ নিষ্পন্ন করতে লাগলেন। সীতার প্রতি রামের এই অবিচল অনুরাগের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে সীতার কানেও সে-কথা গেল। গভীর দুঃখের মধ্যেও রামের এই কথা ভেবে সীতা অনেকটা সান্ত্বনালাভ করলেন। রামের মূর্তি ধ্যান করে তিনি তাঁরই পাশে নিজেকে স্থাপিত করে এই গভীর দুঃখের কিছুটা লাঘব করলেন।



লবণ রাক্ষস বধ

লংকাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করবার পর রামচন্দ্র ভেবেছিলেন রাক্ষসেরা আর বেশী উপদ্রব করতে পারবে না। যেখানে যত রাক্ষস ছিল সকলে রামচন্দ্রের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল, কিন্তু তবুও নানাস্থানে গোপনে গোপনে তাদের অত্যাচার চলতে লাগল। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমের কিছু দূরে ঋষিদের তপোবনে লবণ নামে এক রাক্ষস ছিল। এই রাক্ষসের জ্বালায় মুনিঋষিরা তো অস্থির। তাঁদের যাগযজ্ঞ পণ্ড হবার জোগাড়, তা'ছাড়া প্রাণহানির ভয়ও

যথেষ্ট ছিল। এই রাক্ষস আবার যেমন-তেমন রাক্ষস নয়। সেও তপস্যা করে একটা শূল অস্ত্র পেয়েছিল। এই অস্ত্র যতক্ষণ তার হাতে থাকবে কেউ তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে না, মেরে ফেলতেও পারবে না। এই শূল হাতে করে সে চারদিকে অত্যাচার করে বেড়াতে লাগল।

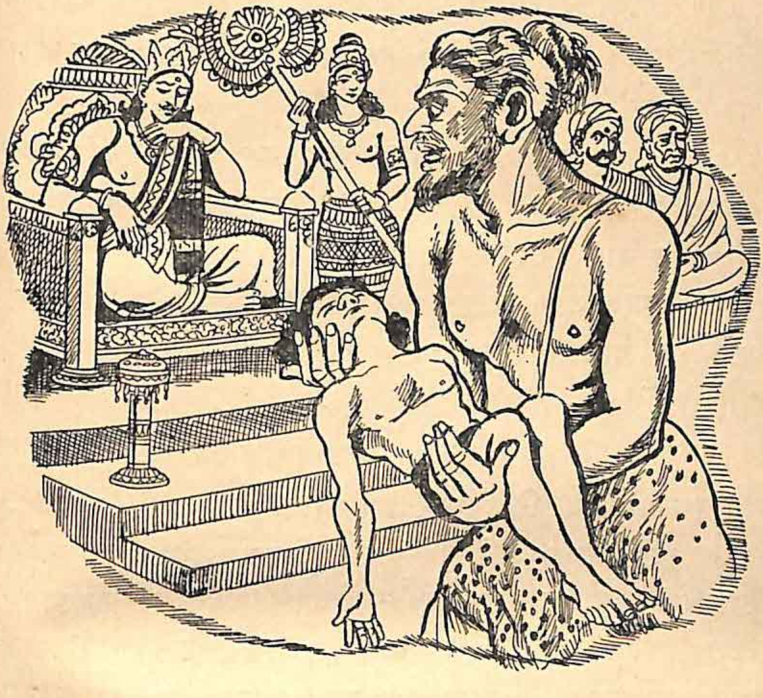
ক্রমে এ খবর শ্রীরামচন্দ্রের কানে পৌঁছল। তিনি অযোধ্যার রাজা, বনের মুনিঋষিরা তাঁর প্রজা। কাজেই যখন তাঁরা এসে রামচন্দ্রের কাছে লবণ দৈত্যের অত্যাচারের কথা বললেন তখন তিনি তাঁদের আশ্বাস দান করে শত্রুঘ্নকে বললেন: "ভাই, তুমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাও। যে ভাবেই পার লবণ দৈত্যকে হত্যা করে মুনিঋষিদের মনের ভয় দূর কর।"

শত্রুঘ্ন শ্রীরামের কথা শুনে আর দেরী না করে তখনই চললেন লবণের সন্ধানে গভীর বনে। এ বন ছিল সরযূ নদীর অপর পারে।

যাবার সময় শত্রুঘ্ন ভাবলেন, একবার সীতাদেবীকে দেখে যাই। পথেই বাল্মীকির আশ্রম। তিনি গিয়ে বাল্মীকিমুনির আশ্রমে অতিথি হলেন। বাল্মীকি তাঁকে পেয়ে খুবই খুশী। আর তা'ছাড়া ঘটনাক্রমে সেই রাত্রেই সীতাদেবী দুটি যমজ সন্তান প্রসব করলেন। রামের পুত্র হয়েছে দেখে শত্রুঘ্নের আর আনন্দের সীমা নেই। তিনি তখনই ফিরে যাচ্ছিলেন রামচন্দ্রকে সংবাদ দিতে। কিন্তু বাল্মীকির অনুরোধে আর অযোধ্যায় গেলেন না। বাল্মীকি বিশেষ করে বলে দিলেন যে এই সংবাদ যেন রামচন্দ্রকে কোনক্রমে দেওয়া না হয়। অগত্যা শত্রুঘ্ন সেই রাত্রি বাল্মীকির আশ্রমে কাটিয়ে পরদিন লবণ রাক্ষসের উদ্দেশে গভীর বনে যাত্রা

করলেন। সে বন যেমন নিবিড়, তেমনি অন্ধকার। শত্রুঘ্ন চারদিকে দৃষ্টি রেখে এগোতে লাগলেন। কিন্তু কোথায় লবণ রাক্ষস? তার কোন সন্ধানই তিনি পেলেন না। আরও গভীর অরণ্যে যেতে-যেতে হঠাৎ দেখতে পেলেন—এক প্রকাণ্ড-শরীর রাক্ষস কতকগুলো মরা বন্যজন্তু হাতে ঝুলিয়ে একদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। হাতে তখন তার শূল নেই। শত্রুঘ্ন বুঝতে পারলেন এই সেই লবণ রাক্ষস। হাতে তার শূল নেই দেখে তিনি ভাবলেন তাকে মারবার এই উপযুক্ত সময়। তিনি তখন কিছুমাত্র বিলম্ব না করে তার সামনে গিয়ে তার সংগে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। লবণ ভাবতেই পারে নি যে হঠাৎ তার সংগে কেউ যুদ্ধ করতে আসতে পারে। সে তখন হাতের মৃত বন্যপশুগুলো ফেলে দিয়ে সামনে গাছ-পাথর যা-পেল তাই নিয়ে শত্রুঘ্নকে আক্রমণ করল। শত্রুঘ্ন সহজ বীর নন, তিনিও জোরালো শরসন্ধান করে রাক্ষসের দেহ ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন। হুংকার দিয়ে বড় বড় পাথর ছুড়ে শিকড় শুদ্ধ বড় বড় গাছ উপড়ে নিয়ে লবণ দৈত্য উন্মত্তের মত লড়াই করতে লাগল আর মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগল—হায়রে, এ সময় যদি শূলটা হাতে থাকত! কিন্তু তখন আর কোন উপায় ছিল না। ছুটে গিয়ে যে বাড়ি থেকে শূল নিয়ে আসে তখন আর তারও সময় নেই। শত্রুঘ্ন তো সহজে ছাড়বার পাত্র নন, কাজেই সাংঘাতিক যুদ্ধ চলল দুজনের মধ্যে। কিন্তু কতক্ষণ আর রাক্ষস পারবে। শত্রুঘ্ন তীর ছুড়ে-ছুড়ে তার শরীর রক্তাক্ত, নির্জীব ও শিথিল করে দিয়েছে। শেষে শত্রুঘ্নের এক তীক্ষ্ণ বাণ সজোরে বুকে এসে লাগল রাক্ষসের। সেই আঘাতেই সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মরণের সময় তার সে কী হুংকার আর আর্তনাদ। সমস্ত

বন যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। দূর থেকে মুনি-ঋষিরা এই যুদ্ধ দেখছিলেন। যখন তাঁরা দেখলেন লবণ রাক্ষস মারা গেছে তখন তাঁরা সব কমণ্ডলু ভরা জল আর হাতে ফুল দূর্বা নিয়ে দলে-দলে এগিয়ে এলেন শত্রুঘ্নকে আশীর্বাদ করতে। শত্রুঘ্ন তখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হলেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভুললেন না। মুনি ঋষিরা তখন শত্রুঘ্নকে কিছুদিন তাঁদের আশ্রমে অতিথি হয়ে থাকতে অনুরোধ জানালেন। শত্রুঘ্ন তাঁদের সন্তুষ্ট করবার জন্য কিছুদিন সেই বনে বাস করলেন। কী সুন্দর সেই বনের শোভা! শত্রুঘ্ন ভাবলেন, এমন চমৎকার জায়গায় একটি নগর স্থাপন করলে বেশ হয়। এই ভেবে নানা প্রকার আয়োজন করে তিনি সেখানে স্থাপন করলেন এক নগর; নাম দিলেন তার মথুরা। কিন্তু তিনি তখনই অযোধ্যায় ফিরে গেলেন না। বছর কয়েক পরে অযোধ্যায় ফিরলেন। শত্রুঘ্ন আসছেন শুনে রামচন্দ্র তাঁর রীতিমত অভিনন্দনের ব্যবস্থা করে রাখলেন।



শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে অকালমৃত্যু

শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরে এলেন বটে কিন্তু সীতার দুটো যমজ পুত্র প্রসবের কথা রামচন্দ্রকে বললেন না। এ বিষয়ে অবশ্য বাল্মীকির নিষেধ ছিল।

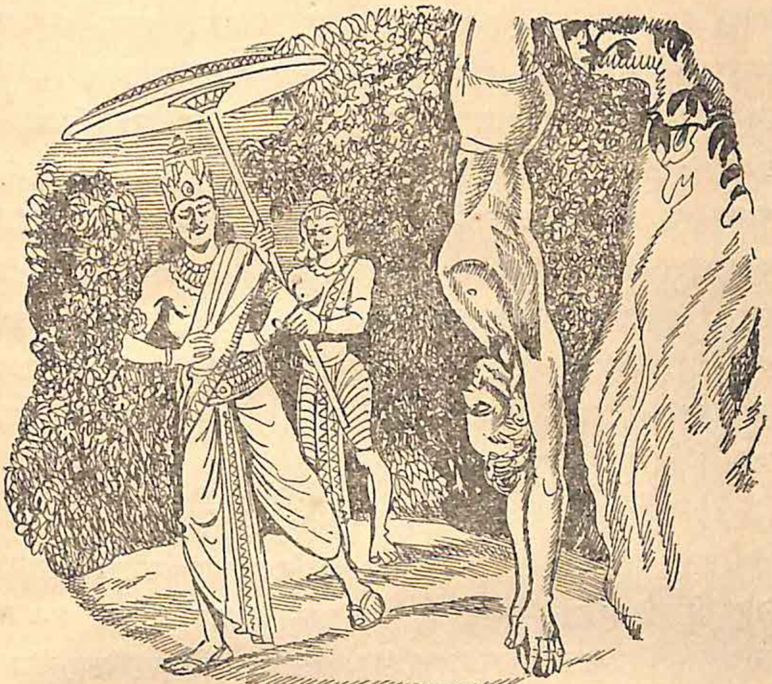
শ্রীরামচন্দ্রের শাসনগুণে প্রজাদের মধ্যে কোন দুঃখ কষ্ট নেই, সকলেই আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটল। রামচন্দ্র রাজসভায় বসে আছেন, তাঁর চারদিকে পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-বয়স্যরাও রয়েছেন। রাজসভা জমজমাট। এমন

সময় হঠাৎ সভার দরজায় এক করুণ ক্রন্দনধ্বনি উঠল। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে, কারও মুখে কোন কথা নেই। রামচন্দ্র বললেন, এ কী ব্যাপার! এমন তো কখনও হয় না। কে কাঁদছে তাঁকে সভায় আসতে দাও।"

এবার দেখা গেল এক ব্রাহ্মণ তার মৃত পুত্রকে কোলে করে হাহাকার করে কাঁদতে-কাঁদতে সভায় প্রবেশ করলেন আর চীৎকার করে বলতে লাগলেন: "দশরথ রাজার সময় আমরা কী সুখেই না ছিলাম। আর এখন রামের রাজত্বে আমাদের কী কষ্টই না হচ্ছে। সকলে যে বলে রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, সে কথা দেখছি মিথ্যা নয়।"

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রামচন্দ্র চমকে উঠলেন। এত যত্নে প্রজাপালন করেও কি সুনাম হল না তাঁর? তাঁর মন বিষাদে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তিনি তখন ব্রাহ্মণকে আরও কাছে আসতে বলে তাঁর সমস্ত কথা শুনলেন—ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রের অকালমৃত্যু হয়েছে কেন। রাজ্যে তো অকালমৃত্যু হবার কারণ নেই। রাম-রাজ্য পুণ্যের রাজ্য। এখানে মানুষ অকালে মরবে কেন?

রামের সভার পণ্ডিতমণ্ডলী তখন রামকে বোঝালেন যে রাজ্যের মধ্যে যে জাতির যে কাজ করবার জন্মগত অধিকার নেই সে যদি সেই কাজ করে তাহলে বর্ণাপচার পাপ হবে। সেই পাপ রাজ্যে দেখা দিলে অকালমৃত্যু তো ঘটবেই। ধর্মের বদলে অধর্মের কাজ কখনও রামরাজ্যে চলতে পারে না।



শ্রীরামচন্দ্রের শম্বুক বধ

শ্রীরামচন্দ্র একথা শুনে ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখনি সন্ধান নিতে লাগলেন তাঁর রাজ্যে কোথায় বর্ণাপচার ঘটেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি দেখতে পেলেন তাঁরই রাজ্যের এক বনে এক দীর্ঘশ্মশ্রুধারী পুরুষ গাছের শাখায় পা রেখে আর নীচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে কঠোর তপস্যা করছে। রাজধানীর এত কাছে এরকম দৃশ্য দেখে শ্রীরামচন্দ্র জানতে পারলেন, যে-লোক তপস্যা করছে নাম তার শম্বুক আর সে জাতিতে শূদ্র।

স্বর্গপ্রাপ্তির আশাতেই তার এই কঠোর সাধনা। তখন রামচন্দ্র বুঝলেন এই ব্যক্তি শূদ্র হয়েও ব্রাহ্মণের মত তপস্যা করছে। এটাই হল বর্ণাপচার। এই পাপেই রাজ্যে অকাল মৃত্যু দেখা দিয়েছে। তখন তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে শম্বুককে কেটে ফেললেন। শূদ্রের দেহ দুভাগ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যে কঠোর তপস্যা করে তাকে স্বর্গে যেতে হত স্বয়ং নারায়ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়ে মৃত্যুর পরে সে স্বর্গেই গেল মহাপুণ্যবলে। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসে দেখেন শম্বুক নিহত হবার সংগে সংগেই ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আবার বেঁচে উঠেছে। অকাল মৃত্যুর কলংক আর অযোধ্যায় রইল না।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটতে লাগল। রামচন্দ্রের সুশাসনের গুণে প্রজারা সকলেই শান্তিতে বাস করতে লাগল। বাল্মীকির আশ্রমে সীতার দুই ছেলে ক্রমে-ক্রমে বড় হতে লাগল। বাল্মীকি তাঁদের নাম রাখলেন লব ও কুশ। তিনি নিজে তাঁদের বেদ পড়ালেন। আর তারপর নিজের রচিত রামায়ণ-গান শেখাতে লাগলেন। লব ও কুশ যখন তাঁদের সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ-গান করতেন কুটীরদ্বারে সীতা সে গান শুনে অঝোরধারে কাঁদতেন। কত পূর্বস্মৃতিই না তাঁর মনে আসত! সেই গানের ঝংকারে বনের পশুপাখি স্তব্ধ হয়ে সে গান শুনত। নদীর কলধ্বনি যেন সে গানের সংগে সুর মিলিয়ে জেগে উঠত বাতাসের বুকে।

এইভাবে সমস্ত রামায়ণ-গান শিখে ফেললেন লব ও কুশ। এবার সংবাদ এল রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। পৃথিবীর দেশে দেশে নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে দূতেরা ছোটাছুটি করতে লাগল। দলে দলে লোক আসতে লাগল অযোধ্যায়। কত দেশের

রাজারাও—কেউ রথে, কেউ হাতীতে তাদের অনুচরবর্গ নিয়ে এলেন অযোধ্যায়। এই সংগে আশ্রমবাসী সমস্ত মুনিঋষিরাও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

বাল্মীকির কাছে এ আমন্ত্রণ পৌঁছতে তিনিও প্রস্তুত হলেন অযোধ্যায় আসবার জন্য। সীতাকে অনেক বুঝিয়ে আশ্রমকন্যাদের উপর তাঁর সেবাযত্নের ভার দিয়ে লব কুশকে সংগে নিয়ে আসবার ইচ্ছা করেছিলেন যজ্ঞস্থলে, কিন্তু শেষে নিজে এলেন না। অবশ্য, তিনি আগেই শুনেছিলেন রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করে তাঁর পাশে বসিয়ে তবেই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন। এ কথা শুনে বাল্মীকি ভাবলেন, আমি তো জানি সীতা নিষ্পাপ। এখন যদি কৌশলে রামচন্দ্রের সংগে সীতার পুনর্মিলন ঘটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আমি আমার জীবনে একটা পরম তৃপ্তি, একটা পরম সান্ত্বনা পাই। এই ভেবে তিনি লব কুশকে পাঠিয়ে অযোধ্যাবাসীর সকলকে রামায়ণ-গান শোনাবার ইচ্ছা করলেন।

অযোধ্যার পথে পথে দুই ভাই লব কুশের রামায়ণ-গান আরম্ভ হল। একে মহাকবি বাল্মীকির রচনা, তাতে আবার লব কুশের মধুর কণ্ঠের সুরলহরী, যে শোনে সেই মুগ্ধ না হয়ে পারে না। আর তাছাড়া কী কমনীয় রূপ তাঁদের! এমন রূপ যে মানুষের হতে পারে—একথা কেউ বিশ্বাস করতেই চাইছিল না। তাঁদের মুখশ্রী দেখে তারা ভাবল, এ বুঝি স্বয়ং রামেরই মুখের প্রতিচ্ছবি। বয়স আর বনবাসীর মত বেশভূষা—এই দুইয়ের পার্থক্য না থাকলে এদের দুজনকে রামচন্দ্র বলেই মনে হত! সারা অযোধ্যা জুড়ে তাঁদের দেখবার জন্য এমন আগ্রহ জেগে উঠল যে লোকে কাজকর্ম সব ভুলে গিয়ে শুধু বলাবলি করতে লাগল তাঁদেরই কথা।

ক্রমে এ সংবাদ পৌঁছল শ্রীরামচন্দ্রের কানে। রামচন্দ্র ভাবলেন, এ ত্বজন গায়ক কে যারা মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে অযোধ্যাবাসীদের? আর তাছাড়া আমারই কীর্তিকথা গানেরই মধ্য দিয়ে জানাচ্ছে জগৎকে। এমন আশ্চর্য ব্যাপার কি করে সম্ভব হল? তখন তিনি লব কুশকে ডেকে তাঁর কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের গুরুর কথা। কে এই গুরু যিনি রামচন্দ্রের সবকথা জানেন,—যার রচনা শ্রেষ্ঠ মহাকবির রচনা, যার রচিত শ্লোকের সংগীতধ্বনি সার্থক হয়ে ওঠে এমন সুর-মূর্ছনায়? কে সেই গুরু,—যার শিষ্যেরা বয়সে তরুণ হলেও এমন সুনিপুণ গায়ক? রামচন্দ্র লব কুশকে দেখে কেমন যেন স্নেহবিগলিত হয়ে পড়লেন। বারবার তাদের মুখের দিকে চেয়েও যেন তাঁর তৃপ্তি হয় না। তিনি যখন জানতে পারলেন মহর্ষি বাল্মীকি এঁদের গুরু তখন রামায়ণ-গান-রচয়িতা বাল্মীকির সংগে দেখা করে তাঁর চরণ-বন্দনা করবার আগ্রহ রামচন্দ্রের মনে জেগে উঠল। ভাইদের সংগে নিয়ে নদী পার হয়ে তাঁরা সকলে উপস্থিত হলেন বাল্মীকির আশ্রমে। তিনি পরম সমাদরে তাঁদের আপ্যায়ন করে ধীরে ধীরে সকল কথা রামচন্দ্রকে জানালেন। সীতাদেবী যে সতীশ্রেষ্ঠা, তাঁর বিশুদ্ধতার তুলনা নেই, আর তিনি যে কায়মনোবাক্যে শ্রীরামচন্দ্রেরই ধ্যান করে থাকেন সে কথাও রামচন্দ্রকে জানালেন মহর্ষি বাল্মীকি। তারপর রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন।

রামচন্দ্র বললেন: "মহর্ষি, আপনার কথা শুনে বুঝলাম সীতা-দেবী সত্যই নিষ্পাপ। এ বিষয়ে আমারও পূর্বে কোন সন্দেহ ছিল না। আমিও সীতা ভিন্ন অন্য কোন নারীর চিন্তা করি নি। সীতাই ছিল

আমার ধ্যান জ্ঞান জপমালা। কিন্তু মহর্ষি, আমি অযোধ্যার রাজা; প্রজাদের মনোরঞ্জনই আমার ধর্ম, প্রজাদের অনুযোগ না শুনলে আমি ধর্মে পতিত হব। এর আগে একবার সীতাদেবী সকলের সামনে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে নিজের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছিলেন, কিন্তু প্রজারা চায় তিনি আর একবার তাদের সকলের সামনে তাঁর বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করুন। আমি মনেপ্রাণে জানি সীতা সর্ববিষয়েই নিষ্পাপ, তাই এ শেষ পরীক্ষার পরে তাকে আমি আবার গ্রহণ করে কৃতার্থ হব।"

বাল্মীকি রামচন্দ্রের একথা শুনে কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তাঁর চোখমুখে কেমন একটা চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে এল, কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি মৃদু হেসে বললেন, "তোমার এ অভিপ্রায় পূর্ণ হবে বৎস।"

রামচন্দ্র ও তাঁর ভাইয়েরা নতমুখে মহর্ষির এই কথা শুনলেন। তারপর তাঁকে প্রণাম করে ধীরে-ধীরে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

রামচন্দ্রের যজ্ঞসভায় লোক আজ আর ধরে না। সকল অযোধ্যাবাসীই ছুটে এসেছে রাজসভায়। মহর্ষি বাল্মীকি স্বয়ং সীতাকে সংগে করে এনেছেন সেখানে। সভার একপাশে ম্লানমুখে সীতাদেবী দাঁড়িয়ে। তাঁর পরণে ঋষিকন্যাদের মতই বল্কল, দেহ প্রায় আভরণ-শূন্য। কেশ আলুলায়িত, সুন্দর পবিত্র মুখখানি শুষ্ক, চক্ষুতে অশ্রুভার। নতমুখী সীতা যেন আজ রামচন্দ্রের কাছে এসেছেন নিজের সমস্ত পবিত্রতা, মধুরিমা ও মহিমা নিয়ে। লংকা থেকে ফেরবার পর আগে কতবার এসেছেন সীতা এই সভায় রাজরানীর গৌরবে। একই আসনে রামচন্দ্রের পাশে বসলে সম্রাজ্ঞীর মহিমা ফুটে উঠত তাঁর সর্বাঙ্গে। কত স্তুতিকার রামচন্দ্রের স্তুতিগানের সংগে তাঁরও বন্দনা করত। শত শত প্রজার কাছে তিনি ছিলেন আদর্শ

প্রতিমা, পুণ্যময়ী দেবী। আর আজ? সভা ঠিক তেমনই আছে। প্রজারাও দলে-দলে এসেছে, রামচন্দ্রও সিংহাসনে বসে আছেন, কিন্তু সীতার স্থান সেই সভার এক প্রান্তে। সীতা যেন আর এসব সহ্য করতে পারছিলেন না, তাঁর হৃদয় বেদনায় কম্পিত হচ্ছিল, তিনি মাঝে মাঝে অশ্রুসিক্ত চোখে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখছিলেন। আজ প্রজাদের কাছে রাজার সামনে হবে তাঁর নির্দোষিতার বিচার।

সীতার এ অবস্থা দেখে রামচন্দ্রের হৃদয়ও অস্থির হয়ে পড়ছিল, তিনি যেন কিছুতেই আত্মসংযম করতে পারছিলেন না। বার বার সীতার দিকে চেয়ে তাঁরও চোখে জলধারা বইছিল। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। সকলেই ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুল। সীতা কিভাবে পরীক্ষা দেবেন—একথাও কেউ ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

এবার বাল্মীকি সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে সমবেত প্রজাদের দিকে চেয়ে রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, "হে মহারাজ রামচন্দ্র, আমি তপস্বী। কখনও মিথ্যা কথা বলি না। তপস্যায় যেটুকু যোগবল আয়ত্ত করেছি তারই প্রভাবে আমি জানি সীতাদেবী বিশুদ্ধ-দেহা, পবিত্রচিত্তা। তুমি লোকাপবাদের ভয়ে সীতাকে আমার আশ্রমে রেখে এসেছিলে। কিন্তু সে অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তোমার দুই পুত্র লব ও কুশ আমার শিষ্য। সীতাদেবী তাঁদের মাতা। আমি তোমাকে একান্ত অনুরোধ করছি—তুমি সীতাদেবীকে পুনর্গ্রহণ কর।"

বাল্মীকির কথা শুনে প্রজারা চঞ্চল হয়ে উঠল। এই বিপুল সভায় গুঞ্জনধ্বনি উঠল। রামচন্দ্র এবার সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বাল্মীকিকে প্রণাম করে বললেন, "মহর্ষি, আপনার আদেশ সর্বদাই আমার শিরোধার্য, কিন্তু সীতাদেবী যদি একটিবার সকলের

সম্মুখে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারেন আমি এই মুহূর্তেই তাঁকে গ্রহণ করে তাঁকে আবার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করব।"

রামচন্দ্র থামলেন। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। সকলের দৃষ্টি সীতার দিকে। মহর্ষি বাল্মীকি স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। লব ও কুশ নির্বাক, নিশ্চল। এবার ধীরে ধীরে সীতার দৃঢ় অথচ বেদনাময় কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি যেন আর এ অপমান সহ্য করতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে যজ্ঞকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আবেগময় কণ্ঠে মাতা ধরিত্রীর উদ্দেশে বললেন, "মা ধরিত্রি, আমি যদি যথার্থ সতী হই, রামচন্দ্র যদি আমার ধ্যানের দেবতা হন, রামচন্দ্র ছাড়া আমি কাউকেও যদি কামনা না করে থাকি তবে মা আমাকে তোমার কোলে স্থান দাও। এ অপমান আর আমি সহ্য করতে পারছি না।"

সীতাদেবীর কণ্ঠস্বর বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে যেন পৃথিবীর অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছল। হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল সকলের চোখের সামনে। সীতাদেবীর সামনের ভূমি ভেদ করে বিদ্যুতের মত ঝলমলে সিংহাসনে উঠলেন এক বিদ্যুতবর্ণা দেবী। তারপর পরম আদরে সীতাদেবীকে কোলে ধারণ করে মুহূর্তের মধ্যে আবার অন্তর্ধান করলেন মাটির নিচে, কোন্ এক পাতালে।

এ ঘটনা ঘটতে অতি সামান্য সময় লাগল। কারুর মুখে কথা নেই, সকলেই নিশ্চল। রামচন্দ্র সিংহাসনের উপর মূর্ছিতপ্রায়, সীতাদেবীর নির্দোষিতা প্রমাণে সকলেই চেতনারহিত, বাক্যহারা। লব কুশের কাতর ক্রন্দন "মা, মা"-ধ্বনি সভামণ্ডপের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সীতাদেবীর অন্তর্ধানে সারা অযোধ্যায় শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল।

সীতাদেবীকে হারিয়ে রামচন্দ্র খুবই কাতর হয়ে পড়লেন, রাজকার্যে আর ভাল করে মন দিতে পারলেন না। যেটুকু রাজ্যশাসন করেন সেইটুকু কর্তব্যের অনুরোধে। স্বর্গের দেবতারা তখন দেখলেন—যে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধের জন্য নারায়ণ রামচন্দ্ররূপে মর্তে এসেছিলেন, সেকাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন তাঁর স্বর্গে ফিরে যাওয়াই দরকার। এইজন্য দেবতারা অন্তকদেবকে গোপনে পাঠালেন রামচন্দ্রের কাছে। তিনি এসে রামচন্দ্রকে ব্রহ্মার কতকগুলি গোপনীয় আদেশ জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তবে সর্ত এই—তাঁরা দুজনে যখন কথাবার্তা বলবেন তখন তৃতীয় কোন ব্যক্তি যেন সেখানে না এসে পড়ে। যদি কেউ আসে রামচন্দ্রকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করবার।

রামচন্দ্র স্বীকৃত হলেন। অন্তকদেবের সংগে নিভৃতে বসে ব্রহ্মার সকল কথাই শুনলেন। ব্রহ্মার নির্দেশও ছিল এবার তাকে স্বর্গে ফিরে যেতে হবে। রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে দ্বারে প্রহরী রেখে ভিতরের কক্ষে বসে এইসব কথা শুনতে লাগলেন।

লক্ষ্মণ দ্বারে প্রহরী হয়ে আছেন ঠিক এমন সময় দুর্বাসা মুনি এসে হাজির। লক্ষ্মণ দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর আগমনের হেতু কি। দুর্বাসা বললেন, "বিশেষ প্রয়োজনে আমি রামচন্দ্রের সংগে দেখা করতে চাই। এখনি তাঁকে সংবাদ দাও।"

লক্ষ্মণ দেখলেন মহাবিপদ। এমন বদরাগী ঋষি ভূ-ভারতে আর একটিও নাই, কথায় কথায় শাপ দেন আর ভস্ম করে দেন। একে যদি বলা যায় রামচন্দ্রের সাথে এখন দেখা হতে পারে না, তাহলে তো সকলকেই ভস্ম করে ফেলবেন। অগত্যা লক্ষ্মণ নিতান্ত অনিচ্ছায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে রামচন্দ্রের কাছে দুর্বাসার আগমনবার্তা

জানালেন। অন্তকদেব তখন রামচন্দ্রকে বললেন, "আপনি পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। আমাদের কথাবার্তার সময় কেউ এ কক্ষে এলে আপনাকে তাকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করতে হবে।"

রামচন্দ্র শুনে স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু কোন উপায় নেই, লক্ষ্মণকে ত্যাগ করতেই হবে।—যে লক্ষ্মণকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন, যে লক্ষ্মণ তাঁর কত সুখদুঃখের সংগী, সেই লক্ষ্মণকে ত্যাগ করতে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তবু তা করতেই হবে, প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে।

লক্ষণ ধীরভাবে রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞার কথা শুনলেন। তাঁর হৃদয় তখন গভীর বেদনায় একান্ত কাতর। নীরবে রামচন্দ্রকে প্রণাম করে তিনি বেরিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদ থেকে। ভাবলেন রামচন্দ্রই যদি আমায় ত্যাগ করলেন তখন আমার জীবনের আর রইল কি। সামনে পবিত্রসলিলা সরযূ নদী। কুলুকুলু শব্দে বহে চলেছে। লক্ষ্মণ তার তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটিবার মাত্র অযোধ্যার দিকে শেষ চাওয়া চেয়ে ঝাঁপ দিলেন সরযূর জলে, আর উঠলেন না।

এদিকে রামচন্দ্রের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সীতা গেলেন, লক্ষ্মণ গেলেন। সমস্ত রাজপুরী শোকে আচ্ছন্ন। রাজসংসারের এ শ্মশানে তাঁর জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল। তিনি যেন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। সমস্ত পৃথিবী তাঁর কাছে তিক্ত, বিস্বাদ হয়ে গেছে। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশকে ডেকে তিনি কুশাবতী রাজ্যের সিংহাসন দিলেন আর কনিষ্ঠ লবকে ডেকে শরাবতীর সিংহাসনে বসালেন। এইবার যেন তাঁর সমস্ত কাজ সমাপ্ত হল। অন্তকদেবের মুখে ব্রহ্মার নির্দেশ তাঁর বার বার মনে পড়ছিল। তিনি আর বিলম্ব না করে স্বর্গে প্রত্যাগমন করলেন। দেবতারা আবার ফিরে পেলেন তাঁদের প্রিয়দেবতাকে নিজেদের মধ্যে।

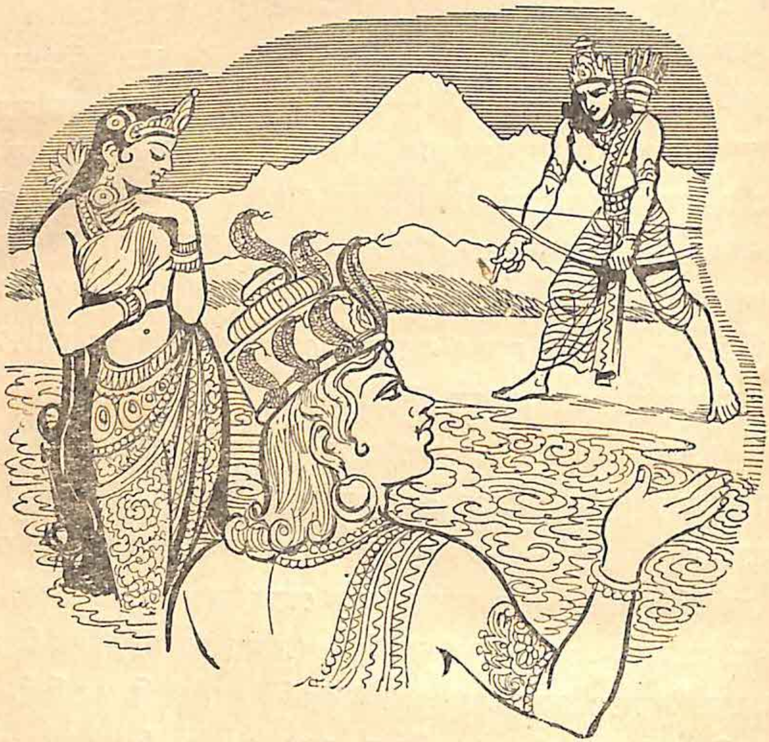
শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পর তাঁর রাজত্ব বিভিন্ন বংশধরদের মধ্যে আট ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু, রামচন্দ্রের নির্দেশমতে সকলের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। কেহ কখনো অন্যান্য বংশধরের রাজ্য আক্রমণ করে নি বা তাদের রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করে নি। বিভিন্ন দেশে থাকলেও সকলেই একই পরিবারভুক্ত পরিজনের মত পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করত। সকল রাজ্যের মধ্যে কুশের রাজধানী কুশাবতী আয়তনে, সমৃদ্ধিতে ও ঐশ্বর্যে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল।

রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পর অযোধ্যার আর সে দশা রইল না। রামচন্দ্র-হারা হয়ে সকলে মনের দুঃখে ঘরবাড়ী ছেড়ে কুশাবতীতে গিয়ে আবার নূতন করে ঘর সংসার পাতল। ক্রমে অযোধ্যা জনশূন্য হয়ে শ্মশানপুরীতে পরিণত হল।

কুশাবতীতে রাজত্ব করবার সময় হঠাৎ কুশ একদিন দেখলেন গভীর রাত্রে এক রমণীমূর্তি তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন। কুশ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে? কি করেই বা এখানে এলেন?" রমণী বললেন, "বৎস, আমি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী, অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তোমার বাবা শ্রীরামচন্দ্র যেদিন থেকে স্বর্গে গমন করেছেন সেদিন থেকেই আমার এই দীন হীন অবস্থা। তোমরা ত কেউ অযোধ্যায় গিয়ে আবার তার পূর্বগৌরব ফিরিয়ে দিলে না? তাই আমার আজ এ দুঃখ, এ কষ্ট। আজ অযোধ্যার বড় বড় বাড়ীগুলো ভেঙে পড়েছে। সেখানে আগাছার জঙ্গল হয়েছে। যে পথে অযোধ্যা-বাসীরা আনন্দে ঘুরে বেড়াত আজ সেখানে শিয়াল কুকুর ছাড়া চলবার আর কেউ নেই। যে সব সুন্দর পুকুরে লোকে স্নান করত আজ সেগুলি কাদায় ভর্তি হয়ে গেছে, আর সেখানে বনের মহিষরা দলে দলে গা ডুবিয়ে বসে আছে, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের খুব বড়

শিল্পীদের আঁকা দামী দামী ছবি আর সাদা পাথরের তৈরী সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলো বনের জন্তুরা সব ছিঁড়ে ও ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছে। রাজপ্রাসাদের প্রমোদবন এখন দারুণ জঙ্গল। সেখানে বানরেরা গাছে গাছে লাফালাফি করে ভাল ভাল গাছ সব ভেঙ্গে দিয়েছে। অযোধ্যাকে দেখলে এখন চোখ দিয়ে জল আসে। আমি সেই রাজ্যের রাজলক্ষ্মী হয়ে কেমন করে সে রাজ্যের শ্মশানে থাকব। তাই আমার একান্ত অনুরোধ তোমরা ফিরে চল আবার অযোধ্যায়। তোমার পূর্বপুরুষেরা যেখানে রাজত্ব করেছেন তোমরাও সেই অযোধ্যাকে আবার রাজধানী করে তোলো।"

অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর কথা শুনে কুশ মনে মনে ভাবলেন ঃ সত্যই ত! যে ভুল হয়েছে এখন তার সংশোধন করা দরকার। অযোধ্যার মত পূর্বপুরুষের বাস্তুভূমিকে ত্যাগ করে অন্য কোন স্থানে থাকা উচিত নয়। তিনি তখন সকলকে ডেকে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর কথা জানালেন ও সকলের সম্মতি পেয়ে আবার অযোধ্যায় ফিরে যাবার উদ্‌যোগ করলেন। আগেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন শিল্পী ও স্থপতিদের, তারপর পৌরকর্মীদের—তারা সকলে গিয়ে অযোধ্যা নগরীর সংস্কারে মন দিল। ক্রমে ক্রমে অযোধ্যা আবার আগের মতই শোভা ধারণ করল। তার নষ্টশ্রী আবার ফিরে এল। এইবার কুশ অসংখ্য পশু বলি দিয়ে বাস্তু দেবতার পূজা করলেন। মহাসমারোহে কয়েকদিন সেই উৎসব চলল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে, আমোদ-প্রমোদে অযোধ্যার পূর্বশ্রী আবার ফিরে এল। এবার কুশ মহা আড়ম্বরে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের সিংহাসনে অযোধ্যার রাজা হয়ে বসলেন।



কুশের সঙ্গে কুমুদ্বতীর বিবাহ

একদিন বসন্তকালে কুশ যখন সরযূ নদীর জলে স্নান করছিলেন, সেই জলবিহারের সময়ে তাঁর হাত থেকে একটি মহাশক্তিশালী রক্ষাকবচ নদীর জলে কোথায় পড়ে যায়। রাজা স্নান করে উঠে রক্ষাকবচ কোথাও দেখতে না পেয়ে মহাচিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই রক্ষাকবচই তাঁর সকল শক্তির মূল। সকল আপদে-বিপদে এই রক্ষাকবচই তাঁকে রক্ষা করে থাকে। আজ সেই রক্ষাকবচ হারিয়ে তিনি যেন পৃথিবী সব শূন্য দেখলেন। এই রক্ষাকবচটি

কুশের সঙ্গে কুমুদ্বতীর বিবাহ

একদিন শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়েছিলেন মহামুনি [illegible]। রামচন্দ্র যখন কুশাবতীতে কুশকে রাজসিংহাসনে বসান তখন তিনি নিজে [illegible] কবচটি পরিয়ে দিয়েছিলেন কুশের হাতে। সেই রক্ষা[illegible]ত আর পাওয়া যাবে না, এই কথা ভেবে কুশের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তিনি তখনি রাজ্যের যত জেলেকে ডেকে সরযূ নদীর মধ্যে কবচটিকে খুঁজতে বললেন। জেলেরা রাজার আদেশে নানাভাবে কবচটির খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু সেটি আর পাওয়া গেল না। তখন জেলেরা রাজা কুশের কাছে এসে বললে, "মহারাজ, এই সরযূ নদীতে নাগরাজ কুমুদনাগ বাস করেন। আপনার হাতের দুর্লভ কবচটি জলে পড়ে যাওয়াতে নিশ্চয়ই তিনি সেটা লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁর কাছ থেকেই হয়ত সেটা পাওয়া যেতে পারে। জেলেদের একথা শুনে কুশ ভাবলেন, কুমুদনাগের এত বড় স্পর্ধা যে আমার কবচ লুকিয়ে রাখে! এখুনি তাকে জব্দ করছি। এই বলে তখনি ধনুকে গড়ু বাণ যোজনা করে কুমুদনাগকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কুমুদনাগ তখন দেখলেন ব্যাপার খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই ছুটে এলেন তাঁর বোন কুমুদ্বতীকে সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে। কুশ তখন খুব রেগে গিয়ে বললেন, "তুমি কেন আমার কবচ অপহরণ করেছ?" তখন কুমুদনাগ বললেন, "মহারাজ, আপনি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর অংশ, আমার কী সাধ্য, যে আপনার কবচ অপহরণ করি? কিন্তু, আমার এই ভগ্নী কুমুদ্বতী হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল এই রক্ষাকবচটি। চমৎকার আভরণটি দেখে ও' তারই কাছে এটি লুকিয়ে রেখেছিল, আমাকে কিছু বলে নি। এখন আমার অপরাধ মার্জনা করে আপনার কবচটি দয়া করে ফিরিয়ে নিন, আর আমার এই বোন কুমুদ্বতীকে বিয়ে করে আপনি তাকে আপনার রাজঅন্তঃপুরে স্থান দিন।



কুশের সঙ্গে কুমুদ্বতীর বিবাহ

একদিন বসন্তকালে কুশ যখন সরযূ নদীর জলে স্নান করছিলেন, সেই জলবিহারের সময়ে তাঁর হাত থেকে একটি মহাশক্তিশালী রক্ষাকবচ নদীর জলে কোথায় পড়ে যায়। রাজা স্নান করে উঠে রক্ষাকবচ কোথাও দেখতে না পেয়ে মহাচিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই রক্ষাকবচই তাঁর সকল শক্তির মূল। সকল আপদে-বিপদে এই রক্ষাকবচই তাঁকে রক্ষা করে থাকে। আজ সেই রক্ষাকবচ হারিয়ে তিনি যেন পৃথিবী সব শূন্য দেখলেন। এই রক্ষাকবচটি

একদিন শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়েছিলেন মহামুনি অগস্ত্য। রামচন্দ্র যখন কুশাবতীতে কুশকে রাজসিংহাসনে বসান তখন তিনি নিজে এই কবচটি পরিয়ে দিয়েছিলেন কুশের হাতে। সেই রক্ষাকবচটি ত আর পাওয়া যাবে না, এই কথা ভেবে কুশের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তিনি তখনি রাজ্যের যত জেলেকে ডেকে সরযূ নদীর মধ্যে কবচটিকে খুঁজতে বললেন। জেলেরা রাজার আদেশে নানাভাবে কবচটির খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু সেটি আর পাওয়া গেল না। তখন জেলেরা রাজা কুশের কাছে এসে বললে, "মহারাজ, এই সরযূ নদীতে নাগরাজ কুমুদনাগ বাস করেন। আপনার হাতের দুর্লভ কবচটি জলে পড়ে যাওয়াতে নিশ্চয়ই তিনি সেটা লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁর কাছ থেকেই হয়ত সেটা পাওয়া যেতে পারে। জেলেদের একথা শুনে কুশ ভাবলেন, কুমুদনাগের এত বড় স্পর্ধা যে আমার কবচ লুকিয়ে রাখে! এখুনি তাকে জব্দ করছি। এই বলে তখনি ধনুকে গড়ু বাণ যোজনা করে কুমুদনাগকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কুমুদনাগ তখন দেখলেন ব্যাপার খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই ছুটে এলেন তাঁর বোন কুমুদ্বতীকে সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে। কুশ তখন খুব রেগে গিয়ে বললেন, "তুমি কেন আমার কবচ অপহরণ করেছ?" তখন কুমুদনাগ বললেন, "মহারাজ, আপনি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর অংশ, আমার কী সাধ্য, যে আপনার কবচ অপহরণ করি? কিন্তু, আমার এই ভগ্নী কুমুদ্বতী হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল এই রক্ষাকবচটি। চমৎকার আভরণটি দেখে ও' তারই কাছে এটি লুকিয়ে রেখেছিল, আমাকে কিছু বলে নি। এখন আমার অপরাধ মার্জনা করে আপনার কবচটি দয়া করে ফিরিয়ে নিন্, আর আমার এই বোন কুমুদ্বতীকে বিয়ে করে আপনি তাকে আপনার রাজঅন্তঃপুরে স্থান দিন।

কুশ সন্তুষ্ট হয়ে রক্ষাকবচটি আবার তাঁর হাতে পরলেন আর কুমুদনাগের কথামতো কুমুদ্বতীকে বিয়ে করলেন। কিছুদিন পরে যখন তাঁদের এক সন্তান জন্মিল তখন কুশ তাঁর নাম রাখলেন অতিথি।

হঠাৎ একদিন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে আহ্বান করলেন স্বর্গে। সেখানে দুর্জয় নামে এক অসুর দেবতাদের উপর খুবই অত্যাচার আরম্ভ করেছে। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁর আক্রমণে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাই ইন্দ্রকে সাহায্য করবার জন্যে মহাবীর কুশের একবার স্বর্গে যাওয়া প্রয়োজন। ইন্দ্রের আমন্ত্রণ পেয়ে কুশ ভাবলেন, তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা ত চিরকাল স্বর্গে দেবতাদের বিপদের সময় সাহায্য করে এসেছেন। তিনি যদি দুর্জয় অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না যান তাহলে তাঁর বংশের কলঙ্ক হবে। তখন কুশ ইন্দ্রকে সাহায্য করবার জন্যে স্বর্গে গেলেন। সেখানে দুর্জয় অসুরের সঙ্গে হলো তাঁর ভীষণ যুদ্ধ। বিপুল পরাক্রমে তিনি অসুরকে নিহত করলেন বটে, কিন্তু নিজেও তার হাতে এমন আঘাত পেলেন যে তাতে তাঁরও প্রাণবিয়োগ হল। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যখন অযোধ্যায় সকলে ফিরে এল তখন চারদিকে হাহাকার পড়ে গেছে। অযোধ্যার মহিমান্বিত বংশে শত্রুর হাতে রাজার মৃত্যু এই প্রথম। সকলে বুঝলো, এইবার সত্যসত্যই অযোধ্যার রাজবংশের বিপর্যয় আরম্ভ হল। পরম সাধ্বী কুমুদ্বতী কুশের জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সহমরণ করলেন। চারদিকে ধন্য ধন্য রব উঠলো।

কুশের মৃত্যুর পরে অযোধ্যার রাজা হলেন তাঁর ছেলে অতিথি। তিনি সদাসর্বদা ধর্মকার্য নিয়েই থাকতেন। ধর্মগ্রন্থ পড়তেন, আর ধার্মিকদের সঙ্গেই বেশী মেলামেশা করতেন, এককথায়, এমন ধর্মপরায়ণ রাজা খুবই কম দেখা যায়। তিনি কারাগারের

যত বন্দী ছিল তাদের সকলকেই মুক্তির আদেশ দিলেন আর যাদের পূর্ব থেকে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল তাদেরও সে আদেশ আর বজায় রাখলেন না। যে-সব ধনী লোক পিঞ্জরের মধ্যে পাখী পুষে রাখতো তিনি রাজাদেশ দিলেন সে-সব পাখী আবার আকাশে ছেড়ে দিতে। স্বাধীনভাবে যে-সব পাখী মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়, আনন্দে গান গেয়ে ওঠে, তাদের ধরে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখা শুধুই যে অপরাধ তা নয়, মহাপাপ। যে-সব পশুকে মানুষ বশ করে তাদের দিয়ে ভারবহন করায় সে-সব পশুদের তিনি মুক্ত করে দিলেন। তাদের আর ভার বইতে হল না। তিনি রাজাদেশ দিলেন গাভীর দুধ প্রথমে পেট ভরে খাবে বাছুর, তারপর যদি অবশিষ্ট থাকে তবে পাবে অযোধ্যাবাসী। বাছুরকে অভুক্ত রেখে গরুর দুধ মানুষে খাবে এটাও ঠিক নয়। যদি কেউ রাজার এসব আদেশ অন্যান্য করে তাহলে তার কঠিন শাস্তি হবে—এইরূপ নির্দেশ দিলেন তিনি। অতিথির মন্ত্রী ও সেনাপতিরা সকলে মিলে তাঁকে ধরে বসলেন, "মহারাজ, আপনার পূর্বপুরুষেরা সকলেই চিরদিন দিগ্‌বিজয়ে গেছেন, আপনিও এবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে চলুন। অতিথি তাঁদের একথা শুনে হেসে বললেন, "আপনারা ঠিক কথাই বলেছেন, শত্রুকে দমন করাই উচিত। কিন্তু, আগে দেহের শত্রু তো বিনাশ করতে হবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, এই ছয় রিপুই দেহের শত্রু। এই ছয় রিপুই আগে বিনাশ করে দেহের উপর দিগ্‌বিজয় করাই কি ভাল নয়!" মন্ত্রীরা রাজার ধর্মজ্ঞান দেখে চমকিত হলেন। অতিথি তখন সবরকম সংযম ও ধর্মকার্য করে ইন্দ্রিয়-শত্রুদের দমন করলেন। এইবার তিনি রাজ্যের বাহিরের শত্রুদের দমন করতে দিগ্‌বিজয়ে

বেরুলেন। যে-সব দেশ তিনি জয় করেন, সে-সব দেশের রাজাদের তিনি বন্ধুভাবেই আলিঙ্গন করে আবার তাঁদের সিংহাসন ফিরিয়ে দেন। চতুর্দিকে শত্রু বলে তাঁর আর কেউ রইল না। শুধু তাই নয়, তাঁর ধর্মপরায়ণতা দেখে সকলেই তাঁকে একবাক্যে সম্রাট বলে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা করল না। রাজ্যে চুরিডাকাতি একেবারেই নেই। রাজার গুণে চোর ডাকাতেরাও ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠলো। রাজ্য জুড়ে রাজার জয়ধ্বনি। এমনি ভাবে সগৌরবে রাজ্যশাসন করতে করতে রাজা অতিথির এলো বাণপ্রস্থের সময়। তিনি তখন তাঁর পুত্র নিষধকে সিংহাসনে বসিয়ে গভীর বনে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতে চলে গেলেন।

নিষধ রাজা হয়ে ভালভাবেই রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। তাঁর পরে তাঁর ছেলে নল হলেন রাজা। নলও সুখ্যাতির সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করলেন। এবার অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসল নলের পুত্র নভঃ। তাঁরও সুশাসনগুণে প্রজারা পরম সুখে দিন কাটাতে লাগল। এইভাবে এক রাজার পর অন্য রাজা সিংহাসনে বসে রঘুবংশের গৌরবধারা বজায় রাখলেন। এবার রাজা হলেন অগ্নিবর্ণ। সুশাসন ছিল তাঁরও লক্ষ্য। প্রজাদের কাছ থেকে সুখ্যাতিও পেয়েছিলেন প্রচুর। কিন্তু, ভাগ্যদোষে তিনি পড়ে গেলেন কুসঙ্গে। তাঁর স্তাবকের দল তাঁকে আমোদ-প্রমোদেই দিন কাটাবার পরামর্শ দিলেন। তিনিও ভাবলেন রাজ্যে ত এখন শান্তি বর্তমান। চিরটাকাল ত রাজ্যশাসন করতে আর মন্ত্রীদের কূট পরামর্শ শুনতেই দিন কেটে গেল। এখন একটু আমোদ-প্রমোদে গা ঢেলে দিতেই বা দোষ কি! এই ভেবে তিনি মদ খেতে আরম্ভ করে দিনরাত নাচগান ও অনেক রকম বিলাসিতা নিয়ে

থাকতে লাগলেন। মদ খেতে খেতে শেষে রীতিমত পাকা মাতাল হয়ে উঠলেন। তাঁর স্বেচ্ছাচারে রাজসংসার ও রাজসভা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠলো। তা ছাড়া, নানা অত্যাচারে তাঁর শরীরে অনেকরকম ব্যাধি দেখা দিল। রাজবৈদ্যেরা পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, আপনি মদ্যপান ছাড়ুন।" রাজা অট্টহাস্য করে রাজবৈদ্যদের দূর করলেন। আবার চলল, পূর্বের মতোই মদ্যপান। ক্রমশঃ রাজার শরীর ভেঙে পড়লো, তাঁকে রাজযক্ষ্মারোগ আক্রমণ করলো। তিনি সেই রোগে উত্থানশক্তিরহিত হয়ে শয্যায় পড়ে রইলেন। অমন-যে সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর একদিন, সে চেহারা এখন নিষ্প্রভ শবের মতো মনে হচ্ছিল। রাজা তবুও মদ ছাড়লেন না। তখন মন্ত্রীরা দেখলেন বিপদ, এমন রাজাকে ত আর অযোধ্যার গৌরবময় সিংহাসনে রাখা চলে না। তখন তাঁরা পরামর্শ করে রাজা অগ্নিবর্ণকে নিয়ে গেলেন এক উপবনে যেন সেখানে মুক্ত বাতাসে রাজার রোগের কিছু উপশম ঘটতে পারে। কিন্তু মন্ত্রীদের চক্রান্ত ছিল অন্যরূপ। তাঁরা সেখানে এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাজাকে নিক্ষেপ করলেন তার মধ্যে। তিনি আর্তনাদ করতে করতে সেই অগ্নিকুণ্ডেই প্রাণত্যাগ করলেন। মন্ত্রীরা ফিরে এসে রটনা করে দিল যে, রাজা অগ্নিবর্ণের মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য কিভাবে হয়েছে তা তাঁরা জানালেন না। রাজ্যের মধ্যে তখন সকলেরই দুশ্চিন্তা, অগ্নিবর্ণের যেহেতু কোন সন্তানাদি নাই তাহলে রাজা হবেন কে? এবার কি তাহলে গৌরবান্বিত রঘুবংশে বাতি দেবার কেউ রইলো না? হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল অগ্নিবর্ণের এক পত্নী গর্ভবতী। মন্ত্রীরা তখন সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলেন যতদিন না রাজার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় ততদিন এই গর্ভবতী রাজমহিষী রাজ্যপরিচালনা করবেন। এরূপ ঘটনা রঘুবংশে

আর কখনও হয় নাই। এবার অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসলেন এক নারী।

রঘুবংশের যে গৌরব এতদিন ধরে সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে রেখেছিল, এখন যেন ক্রমশঃ তার উজ্জ্বলতা হ্রাস হয়ে এলো। রঘুবংশের পূর্বপুরুষেরা যে-সব মহাকীর্তি অর্জন করেছিলেন, সে-সব এখন অতীত-স্মৃতিতে পরিণত হলেও রঘুবংশ তার স্বাভাবিক গতি নিয়ে ক্রমশঃ বয়ে চললো পৃথিবীর বুকে যুগান্তকাল।

সমাপ্ত

1) -200 +30 = -170 = -170
2) -40 +30 = -10 = -180
3) 30 +40 = 70 = -110
4) 40 +100 +250 = 390 = 280

5) -300 +40 = -260 = 20
6) 24 + 80 = 104 = 124
7) -100 +40 = -60 = 64
8) -21 -30 = -51 = 13
9) 300 -40 = 260 = 273
10) -45 -40 = -85 = 188
11) -100 +40 = -60 = 128
12) 60 +100 +40 = 200 = 328
13) 216 +200 +50 +40 +250 +50 = 80

= 1134

14) 400 -90 = 310 = 1444
15) 36 +40 +50 = 126 = 1570
220
1790